রাজ্য কাউন্সিল সভার আহ্বান

সংগঠনকে আরও মজবুত ও ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে প্রতিটি কর্মচারীর কাছে পৌঁছতে হবে

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির বিংশতিতম রাজ্য কাউন্সিলের ষষ্ঠ সভা বিগত ১৬-১৭ মার্চ, ২০২৫ কর্মচারী ভবনের অরবিন্দ সভাকক্ষে

বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী

অনুষ্ঠিত হয়। সভার শুরুতে শোকপ্রস্তাব পাঠ করেন সংগঠনের সভাপতি মানস দাস। তারপর প্রারম্ভিক প্রস্তাবনা পেশ করতে গিয়ে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী বলেন, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির গঠন প্রক্রিয়ার সময়কাল থেকে প্রথম বর্ধিত রাজ্য কাউন্সিল সভা গত ১৩-১৪ জুলাই, ২০২৪ অনুষ্ঠিত হয়। এর পরবর্তীতে দ্রুত ঘটে চলা পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সম্মুখে দাঁড়িয়ে 'সাবজেকটিভ' ও 'অবজেকটিভ' চর্চার মধ্য দিয়ে আগামী দিনে সুসংহত সাংগঠনিক করণীয় নির্ধারণ করা হয়। বর্ধিত রাজ্য কাউন্সিল সভার পরবর্তীতে পরিস্থিতির বাধ্যবাধকতার জন্য নির্ধারিত সময়ান্তর শারীরিক উপস্থিতিতে কাউন্সিল সভা করা সম্ভব হয়নি। আর জি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ন্যায় বিচারের দাবিতে রাজ্যব্যাপী যে জনজাগরণের সৃষ্টি হয়, সমাজের সচেতন অংশ হিসেবে আমাদের তাতে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হয়েছে। সামগ্রিক পরিস্থিতির চাপে আমাদের জেলা সফর ও অন্যান্য সাংগঠনিক কর্মসূচী পেছোতে হয়েছে। সংগঠন তহবিল সংগ্রহের সময়সীমা জানুয়ারি, ২০২৫ পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে হয়েছে। ২০২৩ সালের তুলনায় ২০২৪ সালে আমাদের সদস্য সংগ্রহে কিছুটা ঘাটতি হয়েছে। আমাদের পত্রপত্রিকার গ্রাহকভুক্তিও হ্রাস পেয়েছে।

রাজ্য সরকারের সাত লক্ষ পদ শূন্য। বেকার সমস্যা ভয়ঙ্করভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, রাজ্য বাজেটে এই সমস্যা সমাধানের কোনো ইঙ্গিত নেই। আমরা বিক্ষোভ সভা করেছি। কিন্তু সব জায়গায় করতে পেরেছি কি? আমরা যাদের সদস্য করলাম, তাদের ধরে রাখার ব্যাপারে আমরা উদ্যোগ নিচ্ছি কি? এই প্রতিকূলতার মধ্যেও যে উপাদানগুলো আমাদের কাছে এসেছিল, সেগুলো আমরা কতটা কাজে লাগাতে পেরেছি, তার পর্যালোচনা করতে হবে। বিশাখা গাইডলাইন কার্যকর করার দাবিতে আমরা কতজনকে ব্যাচ পরিধান করাতে পারলাম? সাধারণ মানুষের জ্বলন্ত দাবিগুলোকে যুক্ত করে ১৩ দফা দাবিতে আমরা ছ-ঘণ্টা ব্যাপী অবস্থান কর্মসূচী করেছি। কত অংশকে আমরা আবৃত্তি করতে পারলাম? না পারলে তার পর্যালোচনাটা হওয়া প্রয়োজন। ত্রৈমাসিক রিপোর্ট আমাদের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জমা করতে হবে।

সাধারণ মানুষ ধর্মীয় উন্মাদনার

দেবব্রত রায়

শিকার হচ্ছেন। কর্মচারীদের চেতনার মান বৃদ্ধি না করতে পারলে তাঁরাও ভুলপথে পরিচালিত হবেন। কর্মচারীর পরিবারের কাছেও আমাদের যেতে হবে। পাশাপাশি আমাদের নিজেদের পরিবারের লোকজন আমাদের মুখপত্র পড়ছেন কিনা সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে।

বকেয়া মহার্ঘ ভাতা প্রদান, শূন্যপদে স্থায়ী নিয়োগ, চুক্তিতে নিয়োজিত কর্মচারীদের স্থায়ীকরণ, সপ্তম বেতন কমিশন গঠন ইত্যাদি জরুরী ৫ দফা দাবিতে সামগ্রিক

পীযুষ ধর

আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। কর্মসূচীর বার্তা কর্মচারীদের কাছে পৌঁছোতে এবং কর্মী সংগঠকদের সক্রিয় করতে, সর্বোপরি কর্মচারীদের সাথে নিবিড় যোগাযোগ বৃদ্ধি করে দাবি অর্জনের লক্ষ্যে আগামী ৭-৯ এপ্রিল, ২০২৫ মহকুমা স্তরে ৩ ঘণ্টা ব্যাপী অবস্থান কর্মসূচী করতে হবে। WBMOA চুক্তি প্রথায় নিয়োজিত কর্মচারীদের জন্য ১১ এপ্রিল কলকাতায় কেন্দ্রীয় ভাবে কর্মসূচী করবে। তাতে আমাদের শামিল হতে হবে। ১৮ মার্চ, ২০২৫ দিল্লিতে সর্বভারতীয় সংগঠন ও ফেডারেশনসমূহের যৌথ কনভেনশন অনুষ্ঠিত হবে। সেখান

● দ্বিতীয় পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

নয়াদিল্লিতে যৌথ জাতীয় কনভেনশনের ঘোষণা

আগামী ২০ মে '২৫ দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট

চারটি শ্রমকোড বাতিল, রাষ্ট্রায়ত্ত সম্পদের বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়া বন্ধ করা সহ ৭ দফা দাবিতে আগামী ২০ মে দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে শ্রমিক কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ লড়াই আন্দোলনের মঞ্চ। গত ১৮ মার্চ নয়াদিল্লির প্যারালাল ভবনে অনুষ্ঠিত দশটি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রের কর্মীদের জাতীয় স্তরের ফেডারেশন সমূহের জাতীয় কনভেনশন থেকে এই ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। এই ধর্মঘটকে সফল করার আহ্বান জানিয়ে একটি ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়েছে। এতে বলা হয়েছে আগামী দু'মাস ধরে ১৭ দফা দাবিকে সামনে রেখে দেশজুড়ে প্রচার চালাবেন সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রের স্থায়ী ও অস্থায়ী মিলিয়ে সর্বস্তরের শ্রমিক কর্মচারীরা।

এই কনভেনশনে আলোচনায় উঠে এসেছে কেন্দ্রের মোদি সরকারের উদার অর্থনৈতিক নীতির ভয়ানক আক্রমণে জনজীবনে নেমে আসা সীমাহীন দুর্দশার কথা। এই প্রেক্ষাপটে মোদি সরকারকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এই কনভেনশন। কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমিক বিরোধী, কৃষক বিরোধী নীতিগুলির বিরুদ্ধে বক্তব্য উঠে এসেছে কনভেনশনে। মোদি সরকারের সমস্ত জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে একসঙ্গে গলা তুলে 'না' বলবে দেশের শ্রমিক-কর্মচারী তথা সব অংশের শ্রমজীবী মানুষ আগামী ২০ মে সফল ধর্মঘটের মাধ্যমে।

যে দশটি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের যৌথ মঞ্চ এই কনভেনশনের ডাক দিয়েছিল সেগুলি হল—সি আই টি ইউ, আই এন টি ইউ সি, এ আই টি ইউ সি, এইচ এম এস, এ আই ইউ টি ইউ সি, টি ইউ সি সি, এস ই ডবলিউ এ, এ আই সি সি টি ইউ, এল পি এফ এবং ইউ টি ইউ সি। এছাড়াও কনভেনশনে যোগ দিয়েছিল ব্যঙ্ক, বীমা, কয়লা, ইস্পাত, বন্দর ও ডক, বিদ্যুৎ, টেলিযোগাযোগ, ডাক, রেল, প্রতিরক্ষা, সড়ক পরিবহন প্রভৃতি ক্ষেত্রের জাতীয় সংগঠনগুলি সহ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ফেডারেশনগুলি। উপস্থিত ছিলেন সংগঠিত ও অসংগঠিত শিল্পের স্থায়ী ও অস্থায়ী কর্মী, শিক্ষাকর্মী সহ বিভিন্ন প্রকল্পের কর্মীদের প্রতিনিধিরাও।

শ্রমজীবীদের ব্যাপকতম ঐক্যের পরিধিকে আরও বৃহৎ রূপ দিয়েই ২০ মে ২০২৫-এর সাধারণ ধর্মঘট জায়গা করে নেবে সংগ্রাম আন্দোলনের ইতিহাসের পাতায়। □

আন্তর্জাতিক নারী দিবস প্রতিপালিত

গত ৮ মার্চ, ২০২৫ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে প্রতি বছরের মতো এ বছরেও রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় ভাবে কর্মচারী ভবনের অরবিন্দ সভাকক্ষে বিকেল চারটের সময় একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল ঃ "বর্তমান ভারত ও সমাজ সংস্কারক সাবিত্রী বাঈ ফুলের উত্তরাধিকার"। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী অধ্যাপক দেবেশ দাস।

দেবেশ দাস

আলোচনা সভাটি পরিচালনার জন্য গীতা দে ও দেবলা মুখার্জীকে নিয়ে সভাপতিমণ্ডলী গঠিত হয়। প্রথমে প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী। তিনি বলেন, প্রতি বছরই আমরা আন্তর্জাতিক নারী দিবসের কর্মসূচী পালন করে থাকি। বর্তমান প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে, যখন সারা ভারতবর্ষ জুড়ে একটা বিভাজনের প্রক্রিয়া চলছে, মনুবাদী ধারণা নিয়ে মানুষকে বিভাজিত করা হচ্ছে এবং বিভিন্ন অপকৌশলের মধ্যে দিয়ে সমাজকে, বিশেষ করে মহিলাদের আরো পিছিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে, সেখানে দাঁড়িয়ে এই বছর আমরা সাবিত্রী বাঈ ফুলেকে নিয়ে আলোচনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, যিনি মহিলাদের লড়াই-আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক গৌরবোজ্জ্বল ও পথনির্দেশকের ভূমিকা পালন করেছিলেন। মহিলাদের সমতার প্রশ্নে এবং তাদের মধ্যে শিক্ষাকে প্রসারিত করার ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন। বহু প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিকূলতাকে তিনি জয় করেছিলেন। তাঁর ভূমিকাকে স্মরণ করার মধ্যে দিয়ে আজকে এই সময় দাঁড়িয়ে আমাদের করণীয় নির্ধারণ করতে হবে এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে। আজ রাজ্যের আট হাজারের মতো স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে, ড্রপ আউটের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। যে শিক্ষার মধ্যে দিয়ে সমাজ সচেতনতা জাগ্রত হয়, সেই সমাজটাকে আজকে শিক্ষার আঙিনা থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আন্তর্জাতিক নারী দিবস নিয়ে, নারীদের অধিকার নিয়ে রাজ্য শাসকদল যখন বড় বড় কথা বলছে, তখন রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় মহিলারা আক্রান্ত হচ্ছেন, তিলোত্তমার মতো ঘটনা পর্যন্ত ঘটছে। সমাজে মহিলাদের প্রতি বৈষম্য দূর করতে গেলে নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে

সুতপা হাজরা

হবে আমাদের। সেই প্রতিকূলতাকে জয় করে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সাবিত্রী বাঈ ফুলের মতো নেতৃত্বের কাছ থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে, তাঁর জীবনী আমাদের পড়তে হবে।

সাধারণ সম্পাদকের প্রারম্ভিক বক্তব্যের পর আলোচনা করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় মহিলা উপসমিতির আহ্বায়িকা সুতপা হাজরা। তিনি বলেন, গত বছরের আন্তর্জাতিক নারী দিবসের পর থেকে আজকের এই আন্তর্জাতিক নারী দিবস, এই সময়কালে একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে। মহিলাদের ওপর বিভিন্ন ধরনের আক্রমণ নেমে আসছে। তাদের অধিকার আক্রান্ত হচ্ছে, তাঁরা শারীরিক হিংসার সম্মুখীন হচ্ছেন, বিভিন্ন ধরনের অত্যাচার তাঁদের ওপর হচ্ছে। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি যেমন আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করছে, তেমন সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনও ৫ দফা দাবিকে সামনে রেখে এই কর্মসূচী পালন করছে। যখন অভয়া কাণ্ড নিয়ে গোটা রাজ্য শুধু নয়, গোটা দেশ ও সারা বিশ্ব উত্তাল, তখন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি প্রথমেই নির্দ্বিধায় POSH Act (যেটা ২০১৩ সালে আইন হয়েছিল) যাতে সমস্ত অফিসে কঠোরভাবে লাগু করা হয়, তার জন্য পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি প্রান্তে পৌঁছে যাওয়ার আহ্বান রেখেছিল। আমরা চেষ্টা করেছি। বিশাখা গাইডলাইন যাতে কার্যকরী হয়, তার জন্য আমরা আধিকারিকদের সাথে কথা বলেছি। তাঁরাও সাড়া দিয়েছেন। পুরুষ এবং মহিলাদের মধ্যে মজুরি সাম্য নেই। ৯৬ শতাংশ কর্মরত মহিলা অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করেন। কোভিড পরবর্তী সময় থেকে তাঁরা যে-কোনো মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন। মহিলাদের ওপর অত্যাচার, বিশেষ করে যৌন হিংসা ও অত্যাচার ভয়ঙ্করভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। রাস্তায় বেরিয়ে প্রত্যেক মহিলা কখনো না কখনো অবমাননার শিকার হচ্ছেন। শুধু বাইরে নয়, পরিবারের মধ্যেও মহিলারা হিংসার সম্মুখীন হচ্ছেন। অভয়ার মৃত্যুটা একটা প্রাতিষ্ঠানিক হত্যা। প্রশাসন তাঁকে নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। উল্টে প্রশাসন তাঁর চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে! শাসকদল থ্রেট কালচার এবং রেপ কালচার চালিয়ে যেতে চাইছে। তার বিরুদ্ধে মানুষ রাস্তায় নেমে তাদের ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। একটা জন বিস্ফোরণ ঘটেছে। অভয়ার হত্যার বিরুদ্ধে আন্দোলনটা আমাদের চালিয়ে যেতে হবে। এটাকে ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। শাসকদল হুমকির রাজনীতির মাধ্যমে এই আন্দোলনকে দমন করতে চাইছে। শুধু আমাদের রাজ্য নয়, দেশের অন্য অনেক জায়গাতেও মহিলারা আক্রান্ত হচ্ছেন, অত্যাচারিত হচ্ছেন। মণিপুর তার সাম্প্রতিকতম উদাহরণ। কেন্দ্রীয় শাসকদলও সমানভাবে এর জন্য দায়ী। সাবিত্রী বাঈ ফুলে ২০০ বছর আগে জন্মেছিলেন, যখন অস্পৃশ্যতার যুগ ছিল। তিনি ছিলেন এক মহীয়সী নারী। বহু প্রতিবন্ধকতার মধ্যে তাঁকে কাজ করতে হয়েছিল। ৬৬ বছর বয়সে তিনি প্রয়াত হন। তাঁর জীবনে তিনি মহিলাদের জন্য অনেক দৃষ্টান্তমূলক কাজ করে গেছেন। তিনি তাঁর স্বামী জ্যোতিরাও ফুলের কাছে অনেক সহযোগিতা পেয়েছিলেন।

এর পর এদিনের আলোচনাসভার মূল আলোচক অধ্যাপক দেবেশ দাস আলোচনা করেন। তার আগে তাঁকে পুষ্পস্তবক দিয়ে সম্বর্ধনা জানান গীতা দে। অধ্যাপক দেবেশ দাস বলেন, সাবিত্রী বাঈ ফুলের নাম বাংলার অনেকেই শোনেননি। শুধু বাংলা কেন, সারা ভারতে মহারাষ্ট্রের বাইরে সাবিত্রী বাঈ ফুলে নিয়ে কেউ খুব একটা জানে না। কিন্তু সাবিত্রী বাঈ যা কাজ করেছিলেন সেটা সারা ভারতের জন্যে। সাবিত্রী বাঈ ১৮৩১

● সপ্তম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

সংগ্রামী হাতিয়ার
জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০২৫
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র
বাহান্নতম বর্ষ □ নবম-দশম সংখ্যা □ মূল্য ঃ ৪ টাকা

সম্পাদকীয়

সব হাতে থাক হাতিয়ার

রাজ্য সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের যৌথ প্রচারক ও যৌথ সংগঠক রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র সংগ্রামী হাতিয়ার আগামী মে '২৫-এ বাহান্ন বছর পার হয়ে তিপ্পান্ন বছরে পদার্পণ করছে। নতুন বছরের গ্রাহকভুক্তির কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে জোরকদমে। এই রাজ্যের রাজ্য সরকারী কর্মচারী আন্দোলন শুধু নয়, মধ্যবিত্ত অংশের অন্যান্য আন্দোলনেও এই পত্রিকা ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে এসেছে বরাবর। ৭ মে ১৯৭১-এ প্রকাশিত এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছিল—"... আজ সারা পশ্চিমবাংলায় এক আধা ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাস সৃষ্টি করার জন্য শাসকশ্রেণী মরিয়া হয়ে উঠেছে। ক্ষেত-খামারে, কলে-কারখানায়, অপিসে-দপ্তরে, পাড়ায় পাড়ায় এগিয়ে আসছে মানুষ সীমাহীন ঘৃণা আর জ্বলন্ত বিক্ষোভ বুকে নিয়ে। কঠিন লড়াই লড়বে মানুষ। লড়বে রাজ্য সরকারী কর্মচারী।... ইনকিলাব জিন্দাবাদ।" অর্থাৎ বৃহত্তর সমাজের একটা অংশ হয়ে সরকারী কর্মচারীদের নিজগণ্ডি অতিক্রম করে বৃহত্তর ক্ষেত্রের আন্দোলন-সংগ্রামে নিজেদের সম্পৃক্ত করতে হবে, এই সঠিক চেতনায় কর্মচারীদের উদ্দীপ্ত করার প্রক্রিয়া প্রথম দিন থেকে শুরু করেছিল সংগ্রামী হাতিয়ার। আর পাঁচটা পত্রিকার থেকে এটাই তার বড় ফারাক, এই জন্যই অন্যদের থেকে শত যোজন এগিয়ে আমাদের প্রিয় মুখপত্র।

পত্রিকার নামকরণের মধ্যেই এর সার্থকতা রয়েছে। সংগঠনের মুখপত্রকে লেনিনীয় দর্শনে দেখলে তা হল যৌথ প্রচারক শুধু নয়, যৌথ সংগঠকও বটে। সংগঠনের মুখপত্র শুধু মাত্র প্রচারের হাতিয়ার নয়, সংগ্রামের হাতিয়ারও। আবার শাসকশ্রেণীর নানা আক্রমণকে মোকাবিলা করে বিপরীত মেরুর মতাদর্শের কোনো পত্রিকাকে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করতে হয়। অর্থাৎ সংগ্রামের হাতিয়ার যে মুখপত্রটি, সে নিজেও সংগ্রামী। তাই তো আমাদের বিচক্ষণ পূর্বসুরীরা যথার্থভাবেই পত্রিকার নামকরণ করেছিলেন 'সংগ্রামী হাতিয়ার'।

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র সংগ্রামী হাতিয়ারকে বিভিন্ন সময় নানা আক্রমণের মোকাবিলা করতে হয়েছে। আধা ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাসের সময় দুই বছর এই পত্রিকা প্রকাশ করা যায়নি। শাসকশ্রেণীর পক্ষ থেকে এই পত্রিকাকে বিভিন্ন সময় নানা আক্রমণের মুখে পড়তে হয়েছে। অকুতভয় হয়ে সংগ্রামী হাতিয়ার সব আক্রমণ সামলে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। বাহ্যিক নানা আক্রমণের তুলনায় সংগ্রামী হাতিয়ারের ক্ষেত্রে কর্মচারীদের মনন জগতে যে কোনো ধরনের আক্রমণ মোকাবিলা করা সর্বাপেক্ষা গুরুতর বিষয়।

১৯৯১ সালে দেশ নয়া উদার-অর্থনীতির পথে হাঁটা শুরু করার পর চৌত্রিশ বছর পার হয়ে গেছে। তিন দশকের বেশি সময় ধরে নয়া উদারনীতির নানা নেতিবাচক অভিঘাত মধ্যবিত্ত কর্মচারীদের উপর পড়েছে। মধ্যবিত্ত মূল্যবোধ আক্রান্ত হয়েছে শুধু নয়, মধ্যবিত্ত অংশের সমাজে যে মতামত তৈরি করার ক্ষমতা, তাও প্রবলভাবে আক্রান্ত হয়েছে। খণ্ড খণ্ড ভাবনাকে কার্যকারণ সম্পর্ক দিয়ে একসূত্রে বাঁধার বিপ্রতীপে প্রতিটি সমস্যাকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখার মানসিকতা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই রাজ্যের মধ্যবিত্ত অংশের যে ঐতিহ্য, পরম্পরা তাকে উল্টোস্রোতে ভাসিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। পরিচিতি সত্তার রাজনীতির বিষ ঢুকিয়ে দেওয়ার কৌশল গ্রহণ করা হচ্ছে। ঐতিহাসিকভাবে প্রগতিশীল মানসিকতার ধারাবহনকারী এই রাজ্যের মধ্যবিত্ত অংশের ভিতরে সাম্প্রদায়িকতার অনুপ্রবেশ ঘটানোর চেষ্টা হচ্ছে। ২০১১ সালে রাজ্যের শাসক পরিবর্তন এবং ২০১৪ সালে দেশের শাসন ক্ষমতায় বিজেপির আগমনের ফলশ্রুতিতে এই ধরনের আক্রমণ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এই রাজ্যে সংখ্যাগুরু সাম্প্রদায়িক শক্তি এখানকার শাসকদলের প্রশ্রয়ে তাদের শক্তির ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটিয়ে চলেছে। এদের সংখ্যালঘু বিদ্বেষী প্রচার মধ্যবিত্ত কর্মচারীদের মধ্যে একেবারে দোলাচল সৃষ্টি করছে না তা বলা যাবে না। এইসব আক্রমণ মূলত মানুষের মগজের উপর আক্রমণ। এই আক্রমণের প্রতিষেধক হিসেবে সংগ্রামী হাতিয়ার তার সীমিত ক্ষমতা নিয়ে লড়াই করছে।

বিগত কয়েক বছরের পত্রিকায় সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে, ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে, পরিচিতি সত্তার রাজনীতির বিপদের দিকগুলি নিয়ে একাধিক নিবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু শুধু নির্দিষ্ট বিষয়ে কিছু নিবন্ধ প্রকাশ করেই পত্রিকার কাজ শেষ হয় না। এই আক্রমণগুলির মূল উদ্দেশ্য হল মানুষ যাতে ঐক্যবদ্ধ না হতে পারে এবং এই ধরনের পরিস্থিতি কাজে লাগিয়ে নয়া উদারনীতি আরও বেপরোয়াভাবে যাতে প্রয়োগ করা যেতে পারে, এই সার সত্যটা কর্মচারীদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করানোর দায়িত্বও সংগ্রামী হাতিয়ারকে নিতে হয়। দেশ ও রাজ্যের যে মৌলিক সমস্যাগুলি—মূল্যবৃদ্ধি, বেকারী, কৃষকের ফসলের দাম না পাওয়া, শ্রমিকদের ক্রীতদাসে পরিণত করার প্রচেষ্টা—এই বিষয়ে কর্মচরীদের সচেতন করার দায়িত্বও পত্রিকাকে পালন করতে হয়।

বর্তমান রাজ্য সরকার যখন তার বিরুদ্ধে কথা বললে আমাদের নেতা-কর্মী-অনুগামীদের বদলি করছে, জেলে ভরছে, শারীরিকভাবে আক্রমণ করছে এবং তার বিরুদ্ধে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বে যে তীব্র আন্দোলন হচ্ছে তার খবর সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কাজ পত্রিকা নিয়মিতভাবে করে চলেছে। কর্মচারীদের অর্থনৈতিক অধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকার তীব্রভাবে আক্রান্ত হয়েছে ২০১১ সালে তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে। সংগ্রামী হাতিয়ার তার পাতায় পাতায় সেই ক্ষতগুলিকে ফুটিয়ে তোলার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে এবং পাশাপাশি বিশ্বজুড়ে চরম দক্ষিণপন্থার বাড়বাড়ন্ত এবং আমাদের দেশ ও রাজ্যে তার প্রভাব সম্পর্কে কর্মচারীদের সচেতন করার কাজটাও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ডোনাল্ড ট্রাম্প ও এলন মাস্ক-এর যৌথ কার্যকলাপ দ্বারা সেখানকার সরকারী কর্মচারীদের আক্রান্ত হওয়া, ছাঁটাই হওয়া সুদূর আমেরিকায় হচ্ছে বলে নির্বিকার ভাবে বসে থাকাটা নির্ভেজাল মূর্খতার শামিল। এই বক্তব্য কর্মচারীদের মনোজগতে প্রবেশ করানোর কাজটাও পত্রিকাকে করতে হয়। ট্রাম্প-মাস্ক যা করছে, এদেশে মোদি-আদানি একই কাজ করবে না, তার গ্যারান্টি কেউ দিতে পারবে না। যে কোনো বিষয়ে প্রকৃত সত্য কর্মচারীদের কাছে তুলে ধরার কাজটা করে সংগ্রামী হাতিয়ার। তাই তো সে অনন্য।

পত্রিকার তিপ্পান্নতম বর্ষে পদার্পণের প্রাক্কালে পত্রিকা উপসমিতির পক্ষ থেকে সবাইকে আগাম শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমাদের প্রিয় সংগঠন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি বাম-প্রগতিশীল মতাদর্শে বলীয়ান। স্বভাবতই তার মুখপত্রের আঙ্গিক ও প্রচার কৌশলে সেই মতাদর্শ প্রতিফলিত হয়। স্রোতের বিপরীতে হেঁটেই এগিয়ে চলেছে এই পত্রিকা। পত্রিকার অনেক সীমাবদ্ধতা আছে। বহিরঙ্গ, অন্তর্বস্তু—উভয় দিক দিয়েই সীমাবদ্ধতা অনস্বীকার্য। তবে এই সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করার আন্তরিক প্রয়াস পত্রিকা উপসমিতির পক্ষ থেকে জারি আছে।

পত্রিকা প্রকাশনা এবং বিতরণের মধ্যে ত্রুটিমুক্ত করা যাচ্ছে না। এই বিষয়ে প্রয়াস জারি আছে আমাদের। পত্রিকা প্রকাশনার খরচও প্রচুর বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বাড়তি ব্যয় কিছুটা হলেও সামলানোর একটি উপায় হল পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি। অন্তর্ভুক্ত সমিতির সব সদস্যকে সংগ্রামী হাতিয়ার-এর গ্রাহক করতে হবে এটাই হোক আগামী বর্ষের গ্রাহকভুক্তির শ্লোগান।

সর্বোপরি বলতে হয় একটি মুখপত্র প্রকাশের সফলতা চূড়ান্ত ভাবে নির্ধারিত হয় সেটি প্রত্যেক গ্রাহকের হাতে সঠিক সময়ে পৌঁছালো কি না এবং সবাই তা পাঠ করলেন কি না, এই গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিষয়ের উপর। এই ক্ষেত্রে দুর্বলতা আমাদের যৌথভাবে কাটাতে হবে। পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের ক্ষেত্রে দুর্বলতা কাটানোর আন্তরিক উদ্যোগ আমরা ইতিমধ্যেই গ্রহণ করেছি। একটি দুটি জেলা নিয়মিত পত্রিকা নিয়ে সভা করে, এই উদ্যোগ সব জেলা / অঞ্চল গ্রহণ করুক। পত্রিকার সফ্‌ট কপির ব্যাপকভাবে প্রচার অবশ্যই গুরত্বপূর্ণ। তবে তা যেন হার্ড কপি সকল গ্রাহকের হাতে বিতরণের ক্ষেত্রে উদাসীনতার কারণ না হয়।

সবাই মিলে যৌথভাবে আমাদের ভালোবাসার পত্রিকা 'সংগ্রামী হাতিয়ার'-কে আরও উন্নত স্তরে তুলে নিয়ে যাওয়ার শপথ গ্রহণ করছি। তিপ্পান্নতম বর্ষে গ্রাহকভুক্তির শ্লোগান হোক—"সব হাতে থাক হাতিয়ার"। □

৩১ মার্চ, ২০২৫

প্রথম পৃষ্ঠার পরে

রাজ্য কাউন্সিল সভার আহ্বান

থেকে প্রশাসনকে স্তব্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে। আমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে।

নতুন কর্মচারী নিয়োগ না হওয়া এবং প্রশাসনিক কাঠামোর অভ্যন্তরে পরিবর্তন জনিত কারণে কয়েকটি সমিতির সংযুক্তিকরণ অবশ্যম্ভাবী। যে সমিতিগুলো সংযুক্তিকরণের কথা ভাবছেন, এপ্রিল মাসের মধ্যেই প্রস্তাব পাঠান। একবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন আমাদের এই বছর করতে হবে। এবছর ডিসেম্বর মাসে সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের ১৮তম জাতীয় সম্মেলন মহারাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। তাই আমাদের রাজ্য সম্মেলন ২০২৬-এর জানুয়ারি মাসে হবে। যেসব জেলা রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত করতে চান, তাঁরা প্রস্তাব রাখুন। সম্মেলনের জন্য তহবিল সংগ্রহ করতে হবে। তহবিল সংগ্রহের হার ঃ মোট বেতন ৪০০০০ টাকা পর্যন্ত ১০০ টাকা, ৪০০০১ থেকে ৬০০০০ পর্যন্ত ২০০ টাকা এবং ৬০০০১ এবং তদূর্ধ্বে ৩০০ টাকা। ফ্যামিলি পেনশনার্সদের ক্ষেত্রে ৫০ টাকা এবং রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের ক্ষেত্রে ৫০০ টাকা তহবিল সংগ্রহ করা হবে। জুলাই-আগস্ট, ২০২৫-এর বেতন থেকে এই তহবিল সংগ্রহ করতে হবে। মোট সংগৃহীত তহবিল বণ্টনের হার জেলা : কেন্দ্র ৮০ : ২০ অনুপাতে।

সাধারণ সম্পাদকের প্রারম্ভিক প্রস্তাবনার পর ২১টি জেলা ও কলকাতার ৬টি অঞ্চল সহ মোট ৩০ জন তাঁদের মূল্যবান অভিমত ব্যক্ত করেন। এছাড়াও সভাপতিমণ্ডলীর আহ্বানে দুটি সমিতি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখে। নদীয়া জেলার পক্ষ থেকে একবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলনকে তাঁদের জেলায় অনুষ্ঠিত করার প্রস্তাব দেওয়া হয় এবং অন্যান্য জেলা ও অঞ্চল এই প্রস্তাব সমর্থন করে।

রাজ্য কাউন্সিল সভার দ্বিতীয় দিনে অর্থাৎ ১৭ মার্চ, ২০২৫ ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সঠিক দিশা দেখাতে একটি বিশেষ অধিবেশনের আয়োজন করা হয়। এই অধিবেশনে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচ্য বিষয় ছিল "সমাজমুখী ভাবনায় সাথী হোক পরিবারও"। বক্তা ছিলেন কিশোর বাহিনীর মুখ্য সংগঠক পীযুষ ধর। তাঁকে পুষ্পস্তবক দিয়ে সম্বর্ধনা জানান সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী। তিনি আলোচনা শুরু করার আগে সাধারণ সম্পাদক সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। পীযুষ ধর উপরোক্ত বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, এই অশান্ত সময়ে আপনারা যারা দায়িত্ব নিয়ে সংগঠনটা করছেন তাঁদের প্রত্যেককে আমি এবং আমার সংগঠন কিশোর বাহিনীর পক্ষ থেকে বিপ্লবী অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি ছোটদের নিয়ে কাজ করি এবং ছোটদের সামনেই বলতে অভ্যস্ত। ১৯৪৩ সালে ভারত সভা হলে কিশোর বাহিনীর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য সেই সময় কিশোর বাহিনীর সাথে যুক্ত ছিলেন। পরবর্তী কালে সত্যজিৎ রায়ও যুক্ত হয়েছিলেন। আমরা এখন খুব টালমাটাল অবস্থায় আছি। চারিদিকে শুধু মেরুকরণ, শুধুই বিভাজনের রাজনীতি। ধর্ম, ভাষা, জাতপাত ও আরো নানা ধরনের বিভাজন। এখন গেরুয়া পোশাক পরে তারকেশ্বরে যাওয়ার জন্য মানুষের মনে উন্মাদনার সৃষ্টি করা হচ্ছে, কুম্ভমেলা নিয়ে উন্মাদনা সৃষ্টি করা হচ্ছে। মানুষকে, আমাদের পরিবারকে প্রতিনিয়ত প্রভাবিত করার চেষ্টা চলছে। মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে। ছাত্রছাত্রীদের ভাবানো হচ্ছে, লেখাপড়া করে কী হবে? আমরা কখনও ভাবতে পারতাম যে মহিলারা পর্যন্ত মদ খেয়ে বিসর্জন দিতে যাবেন? অস্ত্র নিয়ে মিছিল করার কথা আমরা ভাবতে পারতাম? আমরা, যারা সমাজের সচেতন অংশ, তাদের রুখে দাঁড়াতে হবে। আমরা কিশোর বাহিনীর পক্ষ থেকে বিভিন্ন জেলায় যাচ্ছি, ছোটদের বোঝানোর চেষ্টা করছি। আমাদের সন্তানদের মহার্ঘ ভাতার বঞ্চনার কথা, থ্রেট কালচারের কথা, অপসংস্কৃতির কথা, ধর্মীয় বিভাজনের কথা বলতে হবে। সুসংস্কৃতিটাকে ছড়িয়ে দিতে হবে তাদের মধ্যে। আপনারা যারা মেরুদণ্ডটাকে সোজা রেখে লড়াই করছেন, তাঁদের দায়িত্ব পরিবারকে সুসংস্কৃতির বাহক করে, চেতনায় সমৃদ্ধ করে আমাদের সঙ্গে নিয়ে আসা। নিজের পরিবারকে বাদ দিয়ে অন্যদের বোঝানো যায় না। চূড়ান্ত আক্রমণের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে আমাদের। শুধু সমস্যা চিহ্নিত করা নয়, সমাধানের পথও আমাদের খুঁজতে হবে।

বিশেষ অধিবেশন শেষ হওয়ার পর যেসব জেলা ও অঞ্চলের বক্তব্য রাখা বাকি ছিল, তাঁরা বক্তব্য রাখেন। সমগ্র আলোচনাকে সূত্রায়িত করে জবাবী বক্তব্য রাখেন সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক দেবব্রত রায়। তিনি বলেন, দীর্ঘদিন পর শারীরিকভাবে আমরা মিলিত হয়েছি। অনেকটা সময় আমরা একসাথে বসে আলোচনার সুযোগ পেয়েছি। এর আগে ১৩-১৪ জুলাই '২৪ বর্ধিত কাউন্সিল সভা হয়েছিল। যা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, তা কতটা রূপায়ণ করতে পেরেছি, তার পর্যালোচনা করেছি। আর জি কর কাণ্ডের পর একটা নতুন ধরনের যুদ্ধে আমরা ব্রতী হয়েছি। বহু মানুষ রাস্তায় নেমেছেন। কিন্তু এই কর্মসূচীর পরেও আমরা আরো বেশি কর্মচারীদের আমাদের সংগঠনের আওতাভুক্ত করতে পারিনি। হুমকির সংস্কৃতির বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিনিয়ত লড়তে হচ্ছে। আমরা যাতে কাজ না করতে পারি তার জন্য প্রশাসন উঠে পড়ে লেগেছে। কিন্তু ৫০ হাজার সদস্য আমাদের করতেই হবে। কার কী দায়িত্ব আমরা বুঝে নিয়েছি। সমিতি, অঞ্চল ও জেলার কী কাজ তা আমরা এই কাউন্সিলসভা থেকে বুঝে নিয়েছি। গত ৮ মার্চ কেন্দ্রীয় কমিটির সভা হয়েছে। ১৯ জানুয়ারি সামাজিক মাধ্যমে কাউন্সিল সভাও হয়েছে। সমিতির নেতৃত্বদের দু-মাস অন্তর জেলাতে যেতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই। কো-অর্ডিনেশন কমিটি ও সমিতিগুলোর যা সম্পদ আছে তা কোথাও নেই। যা সিদ্ধান্ত হবে, কাল থেকেই লেগে যেতে হবে কার্যকরী করার জন্য। অঞ্চল ও জেলা কাউন্সিল সভা করতে হবে। এই কারণে পরবর্তী সপ্তাহ পর্যন্ত কোনো সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সভা করা যাবে না।

নানা ধরনের সামাজিক কর্মসূচী, সাংস্কৃতিক কর্মসূচী আমাদের গ্রহণ করতে হবে বিভিন্ন অংশের মানুষকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে। মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পাশ করার পর শংসাপত্র ও পুরস্কার আবার চালু করতে হবে।

গোটা গ্রাম ফাঁকা হয়ে গেছে, কাজের তাগিদে বাইরে চলে গেছে বহু মানুষ। তাদের পরিবার রয়েছে। লুম্পেনরা শাসন করছে সেসব জায়গায়। আমরা যারা সংগঠিত অংশের মানুষ, তাদের দায়িত্ব নিতে হবে। আমাদের কমফোর্ট জোন থেকে বেরোতে হবে। পরিকল্পনা করে এগিয়ে আসতে হবে, কারণ ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

শ্রম কোড পরিবর্তন করে নতুন শ্রম কোড চালু করলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। তার বিরুদ্ধে ধর্মঘটের আহ্বান আসলে আমাদের সামিল হতে হবে। সারা পৃথিবী জুড়ে স্থায়ী কাজের চরিত্র হারাচ্ছে। চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীদের সংগঠিত করতে হবে আমাদের। দু-একটা সমিতি করছে। বাকিদেরও করতে হবে। সর্বত্র চুক্তি প্রথার কর্মচারীরা রয়েছেন; তাঁদের সংগঠিত করে আমাদের পতাকাতলে নিয়ে এসে আন্দোলন করতে হবে।

পত্রপত্রিকার গ্রাহকভুক্তির বিষয়ে দুর্বলতা রয়েছে। সবসময় টাকাও ঠিকমতো জমা পড়ছে না। বেশ কিছু জেলা, অঞ্চলের পত্রপত্রিকার টাকা বকেয়া রয়েছে।

আগামী কর্মসূচী:-

সদস্যভুক্তি ঃ বিগত বছরের লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে পূর্ব পরিকল্পনা গ্রহণ করে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে ২০২৫ সালের সদস্যভুক্তি পুনঃনবীকরণের কাজ সমাপ্ত করতে হবে। এই সাংগঠনিক দায়িত্ব রূপায়ণে সংগঠন ও সমিতির যৌথ নেতৃত্বদের সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত কর্মচারীদের সাথে যোগাযোগ করেই এ কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনা সহ ত্রৈমাসিক রিপোর্ট প্রেরণে যত্নবান হতে হবে। কেন্দ্র থেকে ফিডব্যাক পাঠানোর দুর্বলতা কাটাতে হবে। অবসরগ্রহণকারী কর্মচারীর তথ্য পেনশনার্স সংগঠনের কাছে প্রেরণ করতে হবে।

তথ্য সংগ্রহের কর্মসূচীঃ কর্মচারীর পরিবারের সাথে নিবিড় যোগাযোগ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে তথ্য সংগ্রহের কর্মসূচীর মাধ্যমে তথ্য ভাণ্ডার গঠনের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছিল। দুটি জেলা ব্যতীত পরিকল্পনা রূপায়ণের উদ্যোগ গ্রহণে দুর্বলতা আছে। এই কাজ যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে অনতিবিলম্বে শুরু করতে হবে।

জেলা সফর ঃ বহুমাত্রিক আক্রমণকে প্রতিহত করে পরিস্থিতি অনুকূলে আনতে একদম নীচুতলা থেকে আন্দোলন সংগঠিত করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে প্রয়োজন ব্লকস্তর পর্যন্ত যোগাযোগ বৃদ্ধি। এখন প্রয়োজন আন্দোলন সংগ্রামের পথে আরো নতুন সক্রিয় কর্মী গড়ে তোলা ও তাদের যুক্ত করা। এ কাজ পূর্ণমাত্রায় রূপায়ণ করতে জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির সহযোগিতায় রাজ্য ভিত্তিক সমিতির ব্লকস্তর পর্যন্ত সফর একান্ত জরুরী। আগামী এপ্রিল-মে, ২০২৫ মাসের মধ্যে সমিতির কেন্দ্রীয় সফরসূচী হবে।

দাবিদাওয়া সংক্রান্ত আন্দোলনের কর্মসূচী ঃ বকেয়া মহার্ঘভাতা প্রদান, শূন্যপদে স্থায়ী নিয়োগ, চুক্তি কর্মচারীদের স্থায়ীকরণ, সপ্তম বেতন কমিশন গঠন ইত্যাদি জরুরী ৫ দফা দাবিতে সামগ্রিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। কর্মসূচীর বার্তা কর্মচারী মানসে তুলে ধরতে এবং কর্মী সংগঠকদের সক্রিয় করতে সর্বোপরি কর্মচারীদের সাথে নিবিড় যোগাযোগ বৃদ্ধি করে দাবি অর্জনের লক্ষ্যে আগামী ৭-৯ এপ্রিল, ২০২৫ মহকুমা স্তরে ৩ ঘণ্টা ব্যাপী অবস্থান কর্মসূচী হবে। এই কর্মসূচীকে আন্দোলনে রূপান্তরিত করতে জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির উদ্যোগে আগামী ২৪-২৬ মার্চ এবং ২-৪ এপ্রিল, ২০২৫ এর

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

২০ মে দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট

রচিত হবে সংগ্রামের ইতিহাসে নতুন অধ্যায়

বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী
সাধারণ সম্পাদক
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি

সারা দেশে মানুষের কষ্ট প্রতিদিনই বাড়ছে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খেটে মানুষ কিভাবে আগামী দিনে বেঁচে থাকবে সেটাই সব অংশের মানুষের উপলব্ধিতে আসছে না। জীবনের এই সত্যটা যাতে বুঝতে না পারে তার জন্য একটা ধুম্রজাল তৈরির চেষ্টা চলছেই। মার্কিন রাষ্ট্রপতি পদে পুনরায় ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতাসীন হওয়ায় আমাদের দেশের অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব, হাতে-পায়ে শিকল বেঁধে আমেরিকা থেকে ফেরত পাঠানো—এগুলির সাথে বহু বিষয় সম্পর্কযুক্ত যা নিয়ে আমাদের বড় বড় প্রচার মাধ্যমে কোনো আলোচনা হবে না। প্রতিদিন অপ্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে টিভি চ্যানেলগুলি তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে আমাদের মনোজগৎকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে। বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। আসলে কর্পোরেট স্বার্থ বহনকারী এই ধরনের মিডিয়া জনসাধারণের আলোচনার পরিসরকে নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে বেঁধে দিতে চাইছে। জাতপাত, ধর্মীয় ভাবাবেগ তৈরি করে কেউ কেউ মুখোশের আড়ালে এমনভাবে বিষয়গুলি উপস্থাপিত করে যেন দেশে আর কোনো সমস্যা নেই। এমন পরিমণ্ডল সৃষ্টি করা হয়, যাতে জীবনের সমস্ত জীবন-যন্ত্রণা ভুলে জাতপাত, ধর্মীয় বিভাজনের মধ্যেই নিজেকে বেঁধে রাখে। প্রশ্ন হল, এইভাবে কি বাঁচা যায়? সাময়িকভাবে বাঁচলেও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কিভাবে জীবন কাটাবে, কিভাবে সমাজের সু-নাগরিক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে তার দায় কি অভিভাবক হিসেবে আমাদের নেই!

সারা দেশে শ্রমিক-কর্মচারীদের জীবনে নেমে আসছে এক গভীর অন্ধকার। কর্পোরেট স্বার্থবাহী শ্রমকোড বাতিল না হলে শ্রমিকরা বাঁচবে না। ছাঁটাই, কাজের ঘণ্টা বাড়ানো, ন্যূনতম মজুরির উপর আঘাত, সামাজিক প্রকল্প ছাঁটাই সহ একাধিক সমস্যায় জর্জরিত দেশের শ্রমজীবী জনগণ। কেন্দ্রের সরকার আম্বানি-আদানি সহ অন্যান্য কর্পোরেট সংস্থার জন্য বিপুল পরিমাণ কর মকুব করেছে। অথচ গরিব খেটে খাওয়া মানুষদের ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধির দাবি করলে ওদের গায়ে জ্বালা ধরে। শিক্ষিত যুবসমাজের কাজের কোনো নিরাপত্তা নেই, অবসরকালীন ভাতা নেই। গত বছরের শেষ দিকে ইনফোসিসের সহ প্রতিষ্ঠাতা নারায়ণ মূর্তি ভারতের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে যুবকদের প্রতি সপ্তাহে ৭০ ঘণ্টা কাজ করার পরামর্শ দেন। এল এন্ড টি-র চেয়ারম্যান এস এস সুব্রহ্মনান আরও এক ধাপ এগিয়ে ৯০ ঘণ্টা কাজের সপ্তাহের পরামর্শ দেন। এমনকি রবিবারেও কাজ করার জন্য কর্মচারীদের আহ্বান জানান। এই বার্তার স্বপক্ষে শিল্পপতি থেকে সরকার, সকলেরই একটাই যুক্তি---দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য এবং বিদেশী কোম্পানীদের আকর্ষণের জন্য নাকি কাজের সময় বৃদ্ধি করা দরকার। কিন্তু এর সত্যতা কতটুকু? অর্থনীতিবিদরা বলছেন গত ১০ বছরে দেশের স্বনির্ভর অর্থনীতি মোদি শাসনে তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। নয়া উদারনীতির আগ্রাসী বাস্তবায়নে কেন্দ্রের সরকার মরিয়া। শুধুমাত্র পুঁজিবাদী মদতপুষ্ট দেশী-বিদেশী কর্পোরেটদের মুনাফার হারের বেপরোয়া বৃদ্ধির ব্যবস্থা করে দিতে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রসম্পন্ন, যেমন ব্যাঙ্ক, বীমা, রেল, কয়লা, ইস্পাত, বিদ্যুৎ, বিমান, জল, প্রতিরক্ষা সামগ্রী উৎপাদন সহ সমস্ত জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ও স্ট্র্যাটেজিক ক্ষেত্রকে তুলে দেওয়া হচ্ছে কর্পোরেটদের হাতে। কার্যত দেশে আর এস এস মদতপুষ্ট এন ডি এ জোট সরকারের মদতে জাতীয় সম্পদের লুট চলছে। দেশে সাম্প্রদায়িক ও কর্পোরেট অশুভ জোটের ভয়ঙ্কর বিপদ তৈরি হয়েছে। দেশের ২৯টি শ্রম আইন পরিবর্তন করে তৈরী করা হয়েছে চারটি শ্রম কোড। যার মূল লক্ষ্য কর্পোরেট স্বার্থে শ্রমিক-কর্মচারীদের দীর্ঘ আন্দোলনের মাধ্যমে অর্জিত অধিকারসমূহ যে শ্রম আইনগুলির মাধ্যমে নিশ্চিত হয়েছিল, তা বাতিল করে যথেচ্ছ শোষণ ও মুনাফার ব্যবস্থাকে নিশ্চিত করা। পুঁজিবাদী প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী উদার অর্থনীতির রূপায়ণের পাশাপাশি আর এস এস-এর মদতপুষ্ট এই মোদি সরকার বিগত নির্বাচনে দেশী-বিদেশী কর্পোরেটদের কাছ থেকে নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অর্থ সহ নানাবিধ সাহায্য গ্রহণ করে। ফলে তাদের মুনাফাকে আরও বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে এই সরকার দায়বদ্ধ। সেই দায়বদ্ধতা নিয়ে শ্রমকোড কার্যকরী করা। দেশের শ্রমিক কর্মচারীদের দাসত্বের শৃঙ্খলে বেঁধে ফেলার উদ্দেশ্যেই তৈরি করা হয়েছে। বৃহৎ শিল্প গোষ্ঠীর স্বার্থে শ্রমিক বিরোধী যেসব নীতি কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ে চলেছে তার পরিণতিতেই দেশের কর্মহীনতা, দারিদ্র্য ও অসাম্য চরম আকার নিয়েছে। ছেঁটে ফেলা হয়েছে দেশের সম্পদের প্রকৃত স্রষ্টাদের ন্যূনতম মজুরি, শ্রমিক-কর্মচারীদের সংগঠিত হওয়ার অধিকার, সামাজিক সুরক্ষা সহ শ্রমিক কর্মচারীদের কল্যাণমূলক সরকারী প্রকল্পগুলি। তা দেশের শ্রমজীবী মানুষ এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিবেশের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। কিন্তু সরকার তাতে কর্ণপাত না করলে সরকারকে বুঝিয়ে দেবার সময় এসেছে। সরকারী মদতে ও সহযোগিতায় ধান্দার পুঁজিপতিরা তাঁদের সেই সৃষ্টিকে লুঠ করবে, তা তারা কোনোভাবেই হতে দেবে না। দেশের শ্রমজীবী মানুষ সরকারকে চ্যালেঞ্জ জানাতে প্রস্তুত।

শোষণ ও আয়ের ক্রমবর্ধমান অসাম্যকে প্রতিহত করতে, সাংবিধানিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার অপচেষ্টাকে রুখতে এবং দেশবাসীর সাথে সামগ্রিক অন্যায়ের প্রতিবাদ জানাতে শ্রমজীবী মানুষ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এগুলি থেকে নজর ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য এন ডি এ সরকার শ্রমজীবী মানুষকে ধর্ম, অঞ্চল, জাত, ভাষা, সংস্কৃতি প্রভৃতির ভিত্তিতে ভাগ করার যত কুৎসিত চেষ্টাই করুক না কেন, ঐক্যবদ্ধভাবেই তাকে পরাস্ত করবেন মেহনতী মানুষ। কেন্দ্রের সরকারের ক্রমাগত বহুমুখী আক্রমণে তাঁরা ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ। সেই ক্ষোভ ও ক্রোধের সর্বাত্মক বহিঃপ্রকাশ ঘটবে ২০ মে। দশটি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশন সমূহের যৌথ মঞ্চ দিল্লিতে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় কনভেনশন থেকে শ্রমিক-কর্মচারীদের অধিকার হরণকারী প্রক্রিয়াকে বন্ধ করতে দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের আওয়াজ তুলেছে। আগামী ২০ মে ঘোষিত ধর্মঘটকে ধরলে ১৯৯১ পরবর্তী সময়কাল থেকে ২৩টি সর্বভারতীয় সাধারণ ধর্মঘট ডাকা হয়েছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরবর্তীতে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত এত ঘন ঘন সর্বভারতীয় ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হওয়ার কোনো নজির নেই। বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নগুলির সাথে কেন্দ্রের ও রাজ্যের শাসক দলের ট্রেড ইউনিয়ন ব্যতীত সকল ট্রেড ইউনিয়ন এই ধর্মঘটে শামিল হচ্ছে। শুধু সর্বভারতীয় স্তরে এই ঐক্য পরিলক্ষিত হচ্ছে তা নয়, শিল্পভিত্তিক ঐক্য গড়ে তোলার প্রয়াসও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এক কথায়, শ্রমিক শ্রেণীকে হীনবল করার জন্য শাসকশ্রেণীর যে কৌশল, তাকে প্রতিহত করার জন্য শ্রমিকশ্রেণীও লড়াইয়ের নতুন স্ট্রাটেজি গ্রহণ করছে। ফলে যতদিন যাচ্ছে সর্বভারতীয় ধর্মঘটে অংশগ্রহণের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। দ্বিতীয়ত, শাসকশ্রেণীও তাদের আর্থিক সংস্কার কর্মসূচীকে কার্যকর করতে গিয়ে পদে পদে বাধা পাচ্ছে।

আমরা এ রাজ্যের সরকারী কর্মচারীরা শ্রমজীবীদের এই ঐক্য গড়ে তোলার প্রক্রিয়ায় শামিল ছিলাম, এখনও আছি। শুধু তফাৎ ২০১১ সাল পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে অনুকূল বাতাবরণ, প্রশাসনের অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক পরিবেশ আমাদের সুযোগ করে দিয়েছিল সামগ্রিক সাংগঠনিক শক্তিকে কেন্দ্রীয় নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নিয়োজিত করার জন্য। ২০১১ সাল থেকে বর্তমান প্রজন্মের কর্মচারীরা এক অপরিচিত আক্রমণ ও বঞ্চনার সম্মুখীন হতে থাকে। প্রশাসনের অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক পরিবেশ সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়, দাবি-দাওয়া উপেক্ষিত হতে থাকে। নামতে শুরু করে অনৈতিক বদলি সহ বিভিন্ন ধরনের প্রশাসনিক আক্রমণ। জেলায় জেলায় এমনকি প্রশাসনের বাইরের রাজনৈতিক শক্তিও কর্মচারীদের বিভিন্নভাবে হেনস্থা করতে শুরু করে। এমতাবস্থায় বিদ্যমান পরিস্থিতি মোকাবিলায় সংগঠনও আন্দোলন-সংগ্রামের পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে শুরু করে। মাঝে দীর্ঘ সময় এই ধরনের কোনো কর্মসূচী গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা না থাকলেও, ১৯৭৭ পূর্ববর্তী প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবিলার অভিজ্ঞতা রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ছিল। সেই অভিজ্ঞতাকে পাথেয় করেই সংগঠন বুক চিতিয়ে এগিয়ে চলেছে। ধর্মঘটের ইতিহাস আমাদের দেশে নতুন নয়। বলা ভালো বহু পুরানো। যতদূর জানা যায় প্রথম ধর্মঘট হয়েছিল ১৮৬২ সালে। হাওড়ার রেল শ্রমিকদের ধর্মঘট দিয়ে শুরু। ১৮৬২ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়ে প্রাক্ স্বাধীনতা ও স্বাধীনোত্তর—উভয় পর্বেই আমাদের দেশে শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী মানুষ বহু ধর্মঘট সংগঠিত করেছেন। এর কোনোটি ক্ষেত্রভিত্তিক, আবার কোনোটি সর্বভারতীয় স্তরের ধর্মঘট। ধর্মঘটগুলির কারণও ছিল বিভিন্ন। কখনও নিজস্ব অর্থনৈতিক বা অধিকার সহ দাবি আদায়ের লক্ষ্যে শ্রমিক-কর্মচারীরা ধর্মঘট করেছেন। তার সর্বশেষ উজ্জ্বল নিদর্শন ১০ মার্চ, ২০২৩ রাজ্য প্রশাসনকে স্তব্ধ করে দেওয়া ধর্মঘট। আবার কখনও রাজ্য বা সর্বভারতীয় স্তরে বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি তাদের ধর্মঘটের পথে যেতে বাধ্য করেছে। অর্থনৈতিক বা অধিকারগত দাবি অর্জন বা অর্জিত অধিকারসমূহকে রক্ষার জন্য আন্দোলন-সংগ্রামের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াগুলি বাধাপ্রাপ্ত হলে, সর্বাধিক শক্তিশালী অস্ত্র হিসেবে ধর্মঘটের প্রয়োগ শিল্প পুঁজিতন্ত্রের জন্মলগ্ন থেকেই দৃশ্যমান। আবার, নিজস্ব বৃত্তিগত দাবিদাওয়ার গণ্ডি পেরিয়ে রাষ্ট্রতন্ত্রের অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধেও ধর্মঘটের মাধ্যমে সরব হয়েছেন শ্রমিক-কর্মচারী, শ্রমজীবী জনগণ—এমন বহু উদাহরণও ছড়িয়ে রয়েছে সারা পৃথিবীতে। এই ধরনের ধর্মঘটগুলির মধ্যে সম্ভবত প্রাচীনতম দৃষ্টান্ত ১৮৩৭ সালে ইংল্যান্ডের চার্টিস্ট আন্দোলন। আমাদের দেশেও প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে বাল গঙ্গাধর তিলকের মুক্তির দাবিতে বোম্বের সুতাকল শ্রমিকদের ১৯০৮ সালে ধর্মঘটের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রয়েছে।

সময়ের নিরিখে সমাজ ও অর্থনীতির বহু পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু আজও ধর্মঘটের গুরুত্ব এতটুকু হ্রাস পায়নি। আজও শোষণ ও বঞ্চনার খাদের কিনারায় পৌঁছে শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী মানুষকে ধর্মঘটের পথে যেতেই হয়। অর্থাৎ শোষণ, বঞ্চনা, অন্যায়, অবিচার যতদিন থাকবে তা কর্পোরেট মালিক, রাষ্ট্র পরিচালক বা রাজ্য সরকার যার তরফেই হোক না কেন, প্রতিবাদ-প্রতিরোধের সর্বশ্রেষ্ঠ অস্ত্র হিসেবে ধর্মঘটের প্রাসঙ্গিকতা থাকবেই। যে শাসকের বিরুদ্ধে শ্রমজীবী জনগণের লড়াইয়ের হাতিয়ার হিসেবে ধর্মঘটের অস্ত্র ব্যবহৃত হয়, তাদের ঘোরতর অপছন্দের বিষয় এটি। তাই একে দুর্বল বা ভোঁতা করার জন্য যুগ যুগ ধরেই তারা বিভিন্ন প্রক্রিয়া গ্রহণ করে। হুমকি প্রদর্শন, শাস্তি প্রদান, আইন করে হাত-পা বেঁধে দেওয়ার চেষ্টা—এসব তো রয়েছেই, তার সাথে বিভিন্ন ভাবে কখনও ধর্মীয় জিগির তুলে, কখনও জাতের নামে নানা কৌশল গ্রহণ করে শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে অনৈক্য তৈরী করেও ধর্মঘটকে ঠেকানোর চেষ্টা করা হয়। এক্ষেত্রে শাসকশ্রেণী সবসময় ব্যর্থ হয়েছে—এ দাবি করা যাবে না। তবে অনেকক্ষেত্রে সফল হলেও তা হয়েছে বিক্ষিপ্তভাবে। সামগ্রিকভাবে শ্রমজীবীদের ধর্মঘট থেকে বিরত করা যায়নি। এমনকি গত শতাব্দীর আশির দশক থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত, যখন প্রায় সারা পৃথিবীজুড়েই উদারবাদী অর্থনীতির পথ অনুসৃত হচ্ছে, তখনও শ্রমিকশ্রেণী তথা শ্রমজীবী মানুষ দেশে দেশে বারংবার ধর্মঘট করেছেন। তবে অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় শ্রমিকশ্রেণী বা শ্রমজীবী জনগণ বর্তমানে বিপুল প্রতিকূলতার মুখোমুখি। প্রথমত, উৎপাদনের উপকরণের আধুনিকীকরণের নামে বৃহদাকার শিল্প সংস্থার সংখ্যা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। একইভাবে সরকারী দপ্তরে কর্মচারীর সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। ফলে কর্মক্ষেত্রে শ্রমিক-কর্মচারী সংগঠিত হওয়ার সুযোগ কমছে। ধর্মঘটের আইনি স্বীকৃতি রয়েছে এমন সংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক-কর্মচারীর সংখ্যাও হ্রাস পাচ্ছে। বৃদ্ধি পাচ্ছে অসংগঠিত ক্ষেত্র, যে ক্ষেত্রে যুক্ত শ্রমিক-কর্মচারীদের ধর্মঘটের অধিকার দূরের কথা, ন্যূনতম সংগঠন করার অধিকারটুকুও নেই। এতদসত্ত্বেও শ্রমিকশ্রেণী তথা শ্রমজীবী মানুষকে দমানো যায়নি। তারা নতুন নতুন পথ খুঁজে বের করে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে চলেছে। সংগঠিত বা অসংগঠিত ক্ষেত্র বা সংগঠন নির্বিশেষে ঐক্য গঠনের প্রক্রিয়াও অতীত সময় থেকে বেশি জোরদার হচ্ছে।

শ্রম দাসত্ব থেকে মুক্তির সংগ্রামের অগ্রগতির পূর্বশর্ত যেমন শ্রমজীবী মানুষের ঐক্য, তেমনি শাসকশ্রেণীর অস্তিত্ব রক্ষার শর্ত হচ্ছে শ্রমজীবী মানুষের ঐক্য ভাঙা। তাই শ্রমিকশ্রেণী শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে যাতে ঐক্য গড়ে না ওঠে এবং সংগঠিত ঐক্যকে ধ্বংস করা যায় সে সম্পর্কে নানান কৌশল অবলম্বন করে। বর্তমান ব্যবস্থায় ক্রমবর্ধমান অসংগঠিত শ্রমিক-কর্মচারীদের হাতিয়ার করে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করে। কারণ আন্দোলন সংগ্রামের মাধ্যমে তৈরী হওয়া ট্রেড ইউনিয়নের প্রভাবের বাইরে সংগঠিত ও অসংগঠিত শ্রমিক-কর্মচারীদের বেশ কিছু অংশ রয়েছে। এসব অংশের ওপর সুবিধাবাদী, সংস্কারবাদী বা শাসকশ্রেণী মদতপুষ্ট ট্রেড ইউনিয়নের প্রভাব রয়েছে। ফলত চিন্তা-চেতনা ও আন্দোলনের ধারার মধ্যে বিচ্ছিন্নতা আছে, কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল বিপুল অসংগঠিত শ্রমিক-কর্মচারীদের মধ্যে রয়েছে শাসকশ্রেণীর আক্রমণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম করার প্রচণ্ড আগ্রহ। তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার দায়িত্ব আমাদের।

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হল শোষণ। এটা সম্পর্কে শ্রমিক-কর্মচারীদের সচেতন করা যেমন আমাদের একটা কাজ, তেমনি শ্রেণী সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটিয়ে এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবসান ঘটানোও যে কোনো সচেতন ট্রেড ইউনিয়নের প্রধান কাজ। একই সঙ্গে হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক শক্তি যারা শাসকশ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতা করছে এবং যাদের বিভেদকামী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক বিভেদ তৈরি হয়, তাদের ভূমিকাটাও উন্মুক্ত করা। আমাদের দায়িত্ব সব অংশের শ্রমজীবী মানুষের নয়া উদারনীতির ফলস্বরূপ দৈনন্দিন জ্বলন্ত সমস্যাবলী নিয়ে তীব্র সংগ্রাম ও আন্দোলনের মাধ্যমে শ্রেণী সচেতনতা গড়ে তোলা ও আন্দোলন সংগ্রামকে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গভিত্তিক রাজনীতি ও হিন্দুত্ববাদী ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে লড়াই সংগ্রামের সাথে যুক্ত করে। শ্রেণী ভাবাদর্শের উপর ভিত্তি করে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম গড়ে তোলা। এটা ঠিক যে দেশে ফ্যাসিবাদ কায়েম না হলেও ক্রমবর্ধমান তীব্র অর্থনৈতিক সঙ্কটের বোঝা শ্রমজীবী মানুষের ওপর চাপানোর জন্য একের পর এক অর্জিত অধিকার হরণের

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

ভারত-মার্কিন চুক্তি প্রসঙ্গে

বিদ্যুত দাস

গত ১২-১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আমেরিকা সফর করেন। এই সফরের জন্য মোদিকে আমেরিকা আমন্ত্রণ জানায়নি। মোদি নিজে থেকেই ট্রাম্পের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য উদগ্রীব হন এবং তার পরিপ্রেক্ষিতেই মোদির আমেরিকা সফর। স্বভাবতই মোদি আমেরিকা পৌঁছোলে আমেরিকা প্রশাসনের কোনো গুরুত্বপূর্ণ কর্তা-ব্যক্তিরা মোদিকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন না। এই সফরে ১৩ ফেব্রুয়ারি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে মোদি সাক্ষাৎ করেন এবং কয়েকটি চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং কিছু উদ্যোগ ঘোষণা করা হয়।

ট্রাম্প দ্বিতীয়বার ক্ষমতাসীন হয়েই ২০ লক্ষ ভারতীয়কে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ঘোষণা করেছেন, তাদের মধ্যে ২০ হাজার ভারতীয়কে গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠিয়েছেন। ইতিমধ্যে ৩৮৮ জন বন্দিদের হাতে-পায়ে শিকল পরিয়ে মালবাহী বিমানে পশুদের মতো ভারতে ফেরত পাঠিয়েছে। আগামীদিনে এই সংখ্যা আরো বাড়বে। মোদির সাহস হয়নি এর প্রতিবাদ করার। অথচ কলম্বিয়া তাদের দেশের নাগরিকদের ফিরিয়ে আনার জন্য বিশেষ বিমান পাঠিয়েছে।

এই সফরের লক্ষ্য ছিল "আমেরিকা ফাস্ট" নীতি এবং পারস্পরিক (reciprocal tariffs) শুল্ক আরোপের হুমকির মধ্যে বাণিজ্য বিরোধ এড়ানো। যদিও আমেরিকার ঘোষিত এই দুই নীতি ভারতের রপ্তানি বাজারকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে এবং ভারতের উচ্চ শুল্কের সমালোচনা এবং মার্কিন চাপে শুল্ক কমানোর প্রতিশ্রুতি ভারতের অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে আরো সীমিত করবে। তবে এই সফরে মোদি ধন্য হয়েছেন এই কারণে যে, মোদি মিত্র আদানির বিরুদ্ধে আমেরিকায় চলা ঘুষের মামলা ট্রাম্প নিজের ক্ষমতাবলে স্থগিত করে দিয়েছেন। এটাই ছিল আমেরিকা সফরে মোদির সেরা প্রাপ্তি।

ভারত মার্কিন চুক্তিসমূহ এবং উদ্যোগ ঘোষণা ঃ

১। বাণিজ্য চুক্তি ঃ ২০৩০ সালের মধ্যে ভারত-মার্কিন বাণিজ্য ৫০০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছোনোর লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। বর্তমান বছরে এই বিষয়ে একটি দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যচুক্তি (Bilateral Trade Agreement) সম্পন্ন করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। ভারত আমেরিকা থেকে জ্বালানি তেল, গ্যাস এবং প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম আমদানি বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এর ফলে দুই দেশের মধ্যে প্রায় ৫০ বিলিয়ন ডলার বাণিজ্য ঘাটতি কমবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে। যদিও ট্রাম্প ভারতের উচ্চ শুল্কের সমালোচনা করে পারস্পরিক শুল্ক আরোপের ঘোষণা করেছেন, যা ভবিষ্যতে দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক বাণিজ্য সম্পর্কে জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে।

২। প্রতিরক্ষা সহযোগিতা প্রসঙ্গে ঃ ট্রাম্প ভারতকে এফ-৩৫ স্টিলথ ফাইটার জেট সরবরাহ করবে। দুই দেশের মধ্যে ১৪.৭৯ বিলিয়ন ডলারের প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এছাড়া "ইউ এস-ইন্ডিয়া কমপ্যাক্ট ফর দি ২১ সেঞ্চুরি" নামে একটি নতুন উদ্যোগ ঘোষণা করা হয়েছে। যার লক্ষ্য ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে চিনের বিরুদ্ধে ভারতকে সাম্রাজ্যবাদী অক্ষের শরিক করা। এর ফলে রাশিয়া ও ইরানের মতো দীর্ঘদিনের মিত্র দেশগুলি ভারত থেকে দূরে সরে যেতে পারে। ভারত-মার্কিন সামরিক চুক্তি ইতিপূর্বেও মোদি সরকারের সময়েও স্বাক্ষরিত হয়েছে। সেই চুক্তিগুলি হল ঃ

● লজিস্টিক এক্সচেঞ্জ মেমোরান্ডাম অব এগ্রিমেন্ট (LEMOA) ২০১৬। এই চুক্তির মাধ্যমে ভারত ও আমেরিকা একে অপরের সামরিক ঘাঁটি ব্যবহার করতে পারবে জ্বালানি ভরার জন্য এবং রক্ষণাবেক্ষণের কাজে।

● কমিউনিকেশনস কম্পাটিবিলিটি এ্যান্ড সিকিউরিটি এগ্রিমেন্ট (COMCASA)—২০১৮ ঃ এই চুক্তি আমেরিকার উন্নত সামরিক যোগাযোগ ব্যবস্থা ও এনক্রিপ্টেড টেকনোলজি ভারতের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে এবং দুই দেশের সেনাদের মধ্যে তথ্য আদান প্রদান বৃদ্ধি পাবে।

● বেসিক এক্সচেঞ্জ অ্যান্ড কো-অপারেশন এগ্রিমেন্ট (BECA)—২০২০ ঃ এই চুক্তির মধ্যে দিয়ে আমেরিকা ভারতকে জিও স্পেসিয়াল (ভূস্থানিক) ডাটা প্রদান করে, যা ক্ষেপণাস্ত্রের নিখুঁত নিশানার জন্য সহায়ক। একই সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চারদেশীয় (যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, জাপান, অস্ট্রেলিয়া) জোট কোয়াডকে ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে চিনের বিরুদ্ধে একটা নিরাপত্তামূলক ও স্ট্রাটেজিক জোটের মঞ্চ গড়ে তুলতে চাইছে। ভারত তার সাথে সহমত পোষণ করেছে। গত সাত বছরে ভারত আমেরিকার কাছ থেকে ১৫০০ কোটি ডলারের অস্ত্র কিনেছে এবং প্যালেস্তাইনে ইজরায়েলের গণহত্যায় ভারত ইজরায়েলকে সমর্থন করেছে ও গোলাবারুদ রপ্তানি করেছে।

৩। শক্তি ও প্রযুক্তি প্রসঙ্গে ঃ ভারত আমেরিকা থেকে তেল ও গ্যাস আমদানি বাড়ানোর পরিকল্পনা করেছে। ছোটো মডুলার রিঅ্যাক্টর, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI), সেমিকন্ডাক্টর এবং কোয়্যান্টাম প্রযুক্তির মতো উদীয়মান ক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্য 'ইন্ডাস ইনোভেশন' এবং 'ট্রাস্ট' উদ্যোগ চালু করার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

এই চুক্তির পথ ধরেই গত ১৩ মার্চ দেশের নিরাপত্তা এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার গোপনীয়তা উপেক্ষা করে ট্রাম্পকে খুশি করতে মুকেশ আম্বানির 'জিও টেলিকম' এবং সুনীল ভারতী মিত্তালের এয়ারটেলের সঙ্গে ইলন মাস্কের স্টারলিঙ্কের যৌথ অংশীদারিত্বে ইন্টারনেট ব্যবসায় যুক্ত করা হয়েছে। এই চুক্তির ফলে একদিকে ভারতের জনগণকে আগামীদিনের ইন্টারনেট পরিষেবা পেতে বর্ধিত মূল্য দিতে হবে, অন্যদিকে দেশের প্রতিরক্ষা স্যাটেলাইট স্পেকট্রাম, অরবিটল স্লটের অবাধ অধিকার, মহাকাশ পরিষেবার একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ কায়েম করবে আমেরিকা।

৪। অবৈধ অভিবাসন ও সন্ত্রাসবাদ প্রসঙ্গে ঃ মোদি এই প্রসঙ্গে জানান যে আমেরিকায় অবৈধভাবে বসবাসকারী ভারতীয়দের ফিরিয়ে নিতে ভারত প্রস্তুত, তবে মানব পাচারের ব্যবস্থা ধ্বংস করার জন্য ট্রাম্পের সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে। তাছাড়া ২৬/১১ মুম্বাই হামলার অন্যতম অভিযুক্ত তাহাব্বুর রানার প্রত্যর্পণে ট্রাম্পের সম্মতি ভারতের জন্য একটি কূটনৈতিক সাফল্য হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে।

মোদির এই আমেরিকা সফর ও চুক্তিগুলো ভারতের নব্য উদারবাদী অর্থনীতির প্রতি আরো গভীর প্রতিশ্রুতি এবং মার্কিন পুঁজিবাদের সঙ্গে জোটের প্রতিফলন। মার্কিন তেল ও গ্যাস আমদানি বৃদ্ধি শ্রমিকদের জন্য সুবিধা এনে না দিলেও বড়ো কর্পোরেট স্বার্থকে প্রাধান্য দেবে।

F-35 ফাইটার জেট ক্রয় ভারতকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রভাবাধীনে আরও গভীরে নিয়ে যাবে এবং মার্কিন প্রভাবের কাছে ভারতের বৈদেশিক নীতির অধীনতার ঝুঁকি আরো বৃদ্ধি পাবে। ট্রাম্প পূর্বেই ঘোষণা করে দিয়েছেন যে, "ভারত শুল্ক কমানোর দাবি মেনে নিয়েছে। তারা শুল্ক কমাচ্ছে।" ভারত আমদানি শুল্ক কমানোর প্রতিশ্রুতি দেওয়ার ফলে ভারতীয় বাজার আমেরিকার পণ্যে ভরে যাবে। দেশীয় শিল্পের সর্বনাশ ঘটবে। কমবে বিনিয়োগ। ডলারের বিনিময়ে টাকার মূল্য কমে যাওয়ায় আমেরিকা থেকে অতিরিক্ত ১০ বিলিয়ন ডলার মূল্যের তেল আমদানিতে জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধি পাবে এবং জনগণকে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করতে হবে।

আমেরিকার রাষ্ট্রপতি পদে দ্বিতীয়বার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর ট্রাম্প সব দেশের জন্য আমদানি কর চালু করলেন ২০ শতাংশ হারে। কানাডা, মেক্সিকোর জন্য আমদানি কর ২৫ শতাংশ এবং চিনের উপর সর্বোচ্চ ৬০ শতাংশ পর্যন্ত (সূত্র ঃ ট্যাক্স ফাউন্ডেশন এবং রয়টার্স) কর লাগু করলেন। চিন আমেরিকার বিরুদ্ধে ডবলিউ. টি.ও.-তে মামলা করেছে। আবার ভারতের মতো কর্পোরেট কর ২১ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৫ শতাংশ ঘোষণা করেছেন ট্রাম্প। অথচ আমেরিকা চিন, মেক্সিকো, কানাডা থেকে বেশি পণ্য কেনে। সেই তুলনায় ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য অনেক কম। তবুও ট্রাম্পের হুঙ্কারে ঘাবড়ে গিয়ে ভারতের বিদেশমন্ত্রী বলেছেন, "আমরা কখনো ডি ডলারাইজেশন চাইনি"। একই সঙ্গে চিন থেকে আমদানি কমিয়ে দিয়েছে ভারত। যদিও ইস্পাত ও অ্যালুমিনিয়ামের ভারতীয় রপ্তানির উপর ২৫ শতাংশ শুল্ক বসিয়েছে আমেরিকা।

মেক্সিকোর কড়া প্রতিক্রিয়ায় শুল্ক আরোপ এপ্রিল পর্যন্ত স্থগিত রাখা হয়েছে। কানাডাও পালটা শুল্ক চাপানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছে। আমেরিকার কয়েকটি পণ্যের উপর পালটা বর্ধিত মাশুল চাপিয়ে দিয়েছে চিন। ২০টি মার্কিন কোম্পানি যেগুলি চিনে ব্যবসা করে তাদের উপর কঠোর বিধিনিষেধ জারি করে চিনের বিদেশ দপ্তর বিবৃতি দিয়ে বলেছে, "কেউ যদি যুদ্ধ করতে চায়, সে বাণিজ্য যুদ্ধ বা অন্য কোনোরকমের যুদ্ধ তাহলে চিন প্রস্তুত রয়েছে।"

ট্রাম্প গর্ব করে ঘোষণা করেছেন এই শুল্ক বৃদ্ধির মাধ্যমে আমেরিকায় সম্পদ ও কর্মসংস্থান বাড়বে। 'আমেরিকা ফাস্ট' বার্তার মাধ্যমে নিত্য নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করার পরও আমেরিকা আর্থিক দৈন্যতা কাটাতে পারছে না। আমেরিকায় কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, শ্রমিকরা কাজ হারাচ্ছেন, শ্রমিকদের মজুরি কমছে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বরাদ্দ ছাঁটাই করতে হচ্ছে। ইলন মাস্ককে সরকারি দপ্তরের পুনর্বিন্যাস করার দায়িত্ব দিয়ে আমেরিকার বিভিন্ন দপ্তরের দক্ষ আমলা সহ ত্রিশ হাজার সরকারি কর্মচারী ও শিক্ষকদের চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। সামরিক বাহিনীর প্রধান, জেনারেলদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ট্রাম্পের শুল্ক যুদ্ধের লক্ষ্য হল একদিকে মার্কিন লগ্নীপুঁজির নিরাপত্তা দেওয়া, অন্যদিকে বিশ্বজুড়ে আধিপত্য বিস্তার করা। টেসলা, আমাজনের জন্য বাজার তৈরি করা। এই পরিস্থিতিতে অর্থশাস্ত্রীরা ১৯৩০-র মহামন্দা উত্তর স্মুট-হলি ট্যারিফ (Smoot Hawley Tariff Act, 1930) অ্যাক্টের উদাহরণ তুলে ধরছেন। এই অ্যাক্টে বাণিজ্যের পথ বন্ধ করে আমেরিকার ক্ষতি হয়েছিল।

সামগ্রিকভাবে মোদির আমেরিকা সফরে যে চুক্তিগুলি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে তার মধ্যে দিয়ে মার্কিনমুখী ভারতের বিদেশনীতি আত্মসমর্পণের আরো এক ধাপ অগ্রগতি ঘটল। □

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা

শিক্ষাঙ্গনে শাসকের দখলদারির নিদর্শন ও মুক্তচিন্তার উপর আঘাত

সাম্প্রতিক সময়ে আবার শিরোনামে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। শিক্ষাঙ্গনে রাজ্যের শাসকদলের দখলদারির রাজনীতির নগ্নরূপ প্রত্যক্ষ করলেন রাজ্যবাসী। গত পয়লা মার্চ, ২০২৫ রাজ্যের শাসকদলের সমর্থক অধ্যাপকদের দ্বারা পরিচালিত সংগঠন ওয়েবকুপার সভা এবং সেমিনার ছিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেই সভায় বক্তব্য রাখতে এসেছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। সেখানে এস এফ আই এবং আরও কিছু বাম ও অতিবাম ছাত্র সংগঠনের সদস্যরা নিজেদের বিভিন্ন দাবিতে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। সভার কাজকর্মে বিঘ্ন ঘটার দাবি করে পাল্টা জমায়েত ও বিক্ষোভ দেখান রাজ্যের শাসকদল সমর্থিত অধ্যাপক সংগঠন।

এরপর শিক্ষামন্ত্রী সভা শেষে বেরিয়ে যাওয়ার সময়ে ছাত্ররা বিভিন্ন গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। ছাত্রছাত্রীদের দাবি শোনার পরিবর্তে সেই গাড়িগুলি দ্রুতগতিতে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে একাধিক ছাত্র আহত হয়। গুরুতর আহত হয় ইন্দ্রানুজ, অভিনব, অনুজ্ঞা, রাসেলদের মতো একাধিক ছাত্রছাত্রী। শুধু তাই নয়, যাদবপুরের ঘটনার প্রতিবাদে রাজ্যজুড়ে ডাকা ছাত্র ধর্মঘটের দিন বিভিন্ন ক্যাম্পাসে আক্রমণ নামিয়ে আনে শাসক আশ্রিত দুষ্কৃতি বাহিনী। মেদিনীপুরে বিক্ষোভরত ছাত্রছাত্রীদের ওপর পুলিশি নির্যাতনের অভিযোগও সামনে এসেছে। সামনে এসেছে থানায় নিয়ে গিয়ে একেবারে প্রান্তিক অংশ থেকে আসা ছাত্রীদের ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের মতো ভয়ংকর অভিযোগ। রাজ্যের আওতায় যে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়, তার মধ্যে যাদবপুর একেবারে প্রথম সারিতে। শুধু এই রাজ্যেরই নয়, দেশের মধ্যে সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে অন্যতম যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। বিভিন্ন সময়ে দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক শক্তিগুলি চেষ্টা করে চলেছে এই ঐতিহ্যশালী শিক্ষাঙ্গনের দখল নেওয়ার। কখনো কখনো এই কাজে দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলির দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে অতিবাম ছাত্র সংগঠনগুলো। কিন্তু যাদবপুরের ছাত্রছাত্রীদের প্রগতিশীল অবস্থানের কাছে বারবার হার মানতে হয়েছে দক্ষিণপন্থী শক্তিকে। যাদবপুরের ছাত্রছাত্রী থেকে অধ্যাপক তথা শিক্ষাকর্মীরা বারবার মুক্তচিন্তার সপক্ষেই নিজেদের মত প্রকাশ করেছেন। এই মুক্তচিন্তার পীঠস্থানের দখল নেবার জন্য বারবার তাই নানা অছিলায় আক্রমণ নামিয়ে আনার চেষ্টা করা হয়, চক্রান্তের জাল বোনা হয়। গত পয়লা মার্চের ঘটনাও এই ধরনের প্রচেষ্টারই ফলশ্রুতি।

গোটা রাজ্যের অধিকাংশ কলেজ ক্যাম্পাসেই অবৈধ ইউনিয়নকে পাথেয় করে জাঁকিয়ে বসে আছে রাজ্যের শাসকদল পোষিত একদল দুষ্কৃতী। তাদের মাধ্যমেই কলেজে কলেজে সংগঠিত হয় কাটমানি-তোলাবাজির সিন্ডিকেট। কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়া চলে অর্থের বিনিময়ে। শিক্ষার্থীদের চুপ করিয়ে রাখতে চলে অবাধ থ্রেট, এর থেকে মুক্ত নয় কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেডিকেল কলেজগুলিও। এই সার্বিক ক্রিমিনাল, লুম্পেন, কাটমানি সিন্ডিকেটের সম্পূর্ণ বাইরে যাদবপুরের মতো মুক্তচিন্তায় বিশ্বাসী একটা ঐতিহ্যবাহী ক্যাম্পাসের থেকে যাওয়াটাই মেনে নিতে পারেনি স্বার্থান্বেষী মহল। নামে ওয়েবকুপা অর্থাৎ অধ্যাপক সংগঠনের মিটিং হলেও সেখানে আগে থেকেই জমায়েত হয়েছিল শাসকদলের আশ্রিত বিভিন্ন দুষ্কৃতি। এরপর যে ঘটনা ঘটে তা কোনও সভ্য সমাজে ঘটে না। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিভিন্ন দাবিতে বিক্ষোভ, অবরোধ, ঘেরাও কোনও নতুন বা অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। কিন্তু মন্ত্রীর গাড়ীর নীচে চাপা পড়ে বিক্ষোভরত ছাত্রদের গুরুতর আহত হবার ঘটনা নজিরবিহীন। এখানেই শেষ নয়। এরপর মিডিয়ার সামনে চলতে থাকে নাটকের পর নাটক, যার অন্যতম কুশীলব স্বয়ং নাট্যকার শিক্ষামন্ত্রী। নাটক ক্যাম্পাসের গণ্ডি ছাড়িয়ে পৌঁছে যায় এসএসকেএম হাসপাতালেও। এরপর শাসকদলের নেতাদের উস্কানিতে ক্যাম্পাস ও ক্যাম্পাসের বাইরে শুরু হয় থ্রেট কালচার। ছাত্রদের চাপা দেওয়া গাড়ির চালকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার বদলে পুলিশের পক্ষ থেকে উল্টে আহত ছাত্রদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়। আর জি কর কাণ্ডে যে থ্রেট কালচারের ভয়াবহতা নিয়ে আমরা চর্চা করেছি, প্রকাশ্য রাস্তায় মূলস্রোতের মিডিয়ার সামনেই সেই থ্রেট কালচার অনুশীলন করলেন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা এবং পুলিশ মুখে কুলুপ এঁটে চুপ করে রইলো।

বিক্ষোভরত ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগ, যাদবপুর দখলে নেওয়ার পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা ছকেই সেদিন ক্যাম্পাসে ঢুকেছিলেন শিক্ষামন্ত্রী। আমাদের রাজ্যে ক্যাম্পাস দখলের ঘটনা দু'হাজার এগারো পরবর্তী সময়ে নতুন কিছু না। বাংলার শিক্ষাব্যবস্থার সম্পূর্ণ সর্বনাশ সাধিত হয়েছে এই দেড় দশকে। একদিকে সরকারী শিক্ষার কাঠামো ধ্বংস করা হয়েছে তিলে তিলে। শিক্ষক নিয়োগে নজিরবিহীন দুর্নীতি। বন্ধ হয়েছে একের পর এক সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল। বাংলায় ৮০০০-এর ওপর স্কুল বন্ধ। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বছর বছর হ্রাস পাচ্ছে উদ্বেগজনকভাবে। এমনকি রেজিস্ট্রেশনের পরেও কমে যাচ্ছে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা। দিনদিন বাড়ছে স্কুলছুটের সংখ্যা। অন্যদিকে সরকারী শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ নষ্ট করা হয়েছে। উচ্চশিক্ষায় খরচ বেড়েছে নির্বিচারে। কলেজে পড়তেই হিমশিম খাচ্ছে রাজ্যের সিংহভাগ শিক্ষার্থী। আর জি কর হাসপাতালের ন্যক্কারজনক ঘটনার পর জুনিয়র ডাক্তারদের সাথে বৈঠকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছিলেন যে রাজ্যের মেডিকেল কলেজগুলি সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলিতে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সেধরনের কোনও উদ্যোগ দেখা যায়নি। যে ছাত্রসংসদ ছাত্রছাত্রীদের কণ্ঠস্বর রূপে কাজ করতো, ছাত্র-ছাত্রীদের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণের মঞ্চ ছিল, সিলেবাসভিত্তিক পঠনপাঠনের বাইরে বিতর্ক-আলোচনার মধ্য দিয়ে বৌদ্ধিক ও মানসিক বিকাশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা পালন করতো, ক্ষমতায় এসেই রাজ্যের বর্তমান শাসকদলের নজর পড়ে সেই ছাত্র সংসদের দিকে। ২০১৩ সালে ছাত্র সংসদ নির্বাচন তুলে দেওয়ার প্রস্তাবিত নির্দেশিকা জারি করেন শিক্ষামন্ত্রী। পরবর্তীতে ছাত্র সংসদগুলিকে গায়ের জোরে বহিরাগত গুন্ডাদের সাহায্যে দখল করার চেষ্টা করতে থাকে শাসকপন্থী ছাত্র সংগঠন। কলেজে ভর্তির সময় নেওয়া কাটমানির

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে

সমকালীন সময়ে আন্তর্জাতিক নারী দিবস

আশীষ ভট্টাচার্য
প্রাক্তন সভাপতি এবং কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি

১৮৮৯ সাল শ্রমজীবী মানুষের লড়াই আন্দোলনে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইল ফলক। ঠিক ১০০ বৎসর আগে অর্থাৎ ১৭৮৯ সালে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার শ্লোগান দিয়ে বাস্তিল দুর্গের পতনের মধ্য দিয়ে ফরাসী বিপ্লবের সূচনা। তারই শতবর্ষে সমগ্র বিশ্বের শ্রমজীবী সংগঠনগুলির নেতৃত্ব ১৮৮৯ সালে প্যারিসে মিলিত হয়। পরবর্তীতে যা দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের স্বীকৃতি লাভ করে। এই সভাতেই ১৮৮৬ সালে ১-৪ মে আমেরিকার হে মার্কেটে ঘটে যাওয়া শ্রমিকদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম ও তাদের উপর অবর্ণনীয় পুলিশি অত্যাচার-হত্যার কাহিনীর বিবরণ শুনে নেতৃবৃন্দ ১৮৯০ সাল থেকে ১ মে সমগ্র বিশ্বে 'শ্রমিক দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত নেন। ঐ সভাতেই বিশ্ব মহিলা আন্দোলনের নেত্রী জার্মানির ক্লারা জেটকিন শ্রমজীবী মহিলাদের সমানাধিকারের দাবিতে সোচ্চার হন এবং তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ সমগ্র বিশ্বের নারীদের আলোড়িত করে।

শুরুতেই উপরিউক্ত বিবরণ উত্থাপিত হল এই কারণেই যে, শ্রেণী বিভক্ত ধনতান্ত্রিক সমাজে 'শ্রমিক দিবস' উদ্‌যাপন-দাবি উত্থাপন, দাবি আদায়ের শপথের মধ্য দিয়েই নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের অধিকার বা শুধুমাত্র নারীদের সমানাধিকারের দাবি অর্জিত হতে পারে না—এই বাস্তবতা ক্লারা জেটকিন অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। শ্রেণী বিভক্ত সমাজের উত্তরণের কালপর্বে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সম্পত্তির উদ্ভব ও 'পরিবার' নামক ইউনিট সংগঠন তৈরির মধ্য দিয়েই 'মাতৃতান্ত্রিক' সমাজ পরিবর্তিত হয় 'পিতৃতান্ত্রিক' সমাজে। তখন থেকেই স্ত্রী অধীনস্থ হয় স্বামীর। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া যা আজও বহমান। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় নারীরা শোষিত হচ্ছে মূলত নারী হিসাবে, শ্রমিক হিসাবে ও নাগরিক হিসাবে। নারীদের এই শোষণের মুক্তি সম্ভব একমাত্র মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায়। যা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি দুনিয়ার সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে; বিশেষত সোভিয়েত রাশিয়ায়।

তাই, যতদিন পর্যন্ত সেই শোষণমুক্ত আদর্শ-সমাজব্যবস্থা আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত না হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত নারীদের সমানাধিকারের দাবি, অর্থনৈতিক ও সামাজিক লিঙ্গ বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই—শুধুমাত্র মহিলাদের একক লড়াই নয়। নারীদের এই লড়াইয়ে পশ্চাৎপদ 'পিতৃতান্ত্রিক' মূল্যবোধকে ঝেড়ে ফেলে একজন আলোর পথের সহযাত্রী বা সহযোদ্ধা হিসাবে সকল চেতনা সম্পন্ন পুরুষদেরও 'নারী দিবসের' সংগ্রামে যুক্ত হতে হবে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক শ্রমজীবীদের আন্দোলনের 'আগুন ঝরানো' দশক। একদিকে জার শাসিত রাশিয়ায় একের পর এক কারখানায় ধর্মঘট আর ধর্মঘটে উত্তাল; হাজার হাজার শ্রমিকের রক্ত স্রোতে ১৯০৫-এ ফেব্রুয়ারিতে রক্তাক্ত 'অসমাপ্ত বিপ্লব'। অপরদিকে আমাদের দেশও উত্তাল বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে। ঐ সময়েই কাজের ঘণ্টা কমানোর দাবিতে ময়মনসিং জেলায় সেটেলম্যান্ট কর্মচারীরা ও দেশজুড়ে প্রেসের কর্মচারীরা লাগাতার ধর্মঘটে শামিল। পরবর্তীতে ১৯০৮-এর জুলাই মাসে শ্রমিক নেতা তিলকের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ও শাস্তির বিরুদ্ধে শ্রমিকদের টানা ৬ দিনের প্রথম রাজনৈতিক ধর্মঘট ও জনগণের হরতালে রাশিয়ার অসমাপ্ত বিপ্লবের প্রভাব পড়েছিল। ঠিক একইভাবে ১৯০৭-এ স্টুটগার্টে প্রথম আন্তর্জাতিক মহিলা সম্মেলনের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে আমেরিকার নিউইয়র্কের মহিলা দর্জি শ্রমিকরা ১৯০৮-এর ৮ মার্চ ভোটাধিকারের দাবিতে গর্জে ওঠেন এবং ১৫ হাজার মহিলা দর্জি শ্রমিক ঐতিহাসিক আন্দোলনে শামিল হন। যদিও তার ৫০ বৎসর আগে ১৮৫৭ সালে ভারতের 'সিপাহী বিদ্রোহ', যাকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ মার্কস বলেছিলেন ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম, যে সংগ্রামে ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাঈয়ের নেতৃত্বদায়ী অদম্য লড়াই ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সিপাহীদের ঐক্যবদ্ধ বিদ্রোহ পরবর্তীতে ভীত ব্রিটিশ শাসকদের প্রত্যক্ষ মদতে ভারতে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার বীজ রোপন হয়, সেই সময়ও সুদূর নিউইয়র্কের নারী দর্জি শ্রমিকরা কাজের ঘণ্টা কমানোর দাবিতে আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের পর সোভিয়েত রাশিয়াই প্রথম ৮ মার্চ দিনটিকে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের মর্যাদা দেয় ও ১৯১৮ সালেই নারীদের ভোটাধিকার সহ সমানাধিকারের প্রশ্নে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। যদিও উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশ ইংল্যান্ডে আরও ১০ বৎসর পর নারীদের ভোটাধিকার স্বীকৃতি পায়। পরবর্তীতে ১৯৭৫ সালে রাষ্ট্রসংঘ ৮ মার্চ দিনটিকে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের স্বীকৃতি প্রদান করে। সমানাধিকারের দাবিতে, সামাজিক লিঙ্গ বৈষম্যের বিরুদ্ধে নারীদের কণ্ঠস্বর বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিতে অন্যান্য সকল নারী আন্দোলনের নেত্রীদের মধ্যে অগ্রগন্য বিশ্ব মহিলা আন্দোলনের পুরোধা ক্লারা জেটকিন, আলেকজান্দ্রা কোলনতাই, নাদেজদা ক্রুপস্কুয়া, রোজা লুক্সেমবার্গ-দের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বর্তমান বিশ্ব ধনিকতন্ত্রের শিরোমণি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো ও নিউইয়র্ক শহর দুটি যথাক্রমে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস ও আন্তর্জাতিক নারী দিবসের সূতিকাগার হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

রাষ্ট্রসংঘের আন্তর্জাতিক নারী দিবসের স্বীকৃতির ৫০ বৎসর পূর্ণ হল এই বছর। এই সময়কালে সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পতনের ফলে বিশ্ব রাজনীতির ভারসাম্য ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার দিকে হেলে পড়েছে। ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার ছলেবলে কৌশলে উন্নয়নশীল দেশগুলি বাধ্য হয়েছে উদারীকরণ, বিশ্বায়ন, বেসরকারীকরণ-এর ব্যবস্থা প্রয়োগে। সেই নয়া উদারীবাদী নীতি আজ দীর্ঘস্থায়ী সঙ্কটে। সঙ্কটের বোঝা যেমন—কর্মচারী ছাঁটাই, মজুরী হ্রাস, চুক্তি প্রথা, নির্দিষ্ট মেয়াদী কাজ, বেকারত্ব, ধনী-দরিদ্রের বিপুল বৈষম্য বৃদ্ধির ফাঁসে শ্রমজীবীরা দিশাহারা। এই সঙ্কটের ফাঁসে আক্রান্ত নারীরাও। নয়া উদারীবাদী নীতির ফলে শ্রমজীবীদের Appearance-এর ক্ষেত্রে কিছু প্রসাধনী (Cosmetic) পরিবর্তন ঘটলেও Essence-এর কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। শোষণ বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। মানুষের সংকটজাত ক্ষোভকে প্রশমিত করতে বিভাজনের রাজনীতিকে আমদানী করা হয়েছে। ধর্ম-বর্ণ-জাত-ভাষা সহ বিভিন্ন পরিচিতি সত্তাকে ব্যবহার করে উগ্র দক্ষিণপন্থী শক্তির পুনরুত্থান ঘটেছে দুনিয়াজুড়ে। নয়া উদারবাদী নীতির ফলে লাভবান কর্পোরেট শিবিরের প্রত্যক্ষ মদতে ও funding-এ দেশে দেশে উগ্র দক্ষিণপন্থী শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে ও রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করছে। আমাদের দেশও তার ব্যতিক্রম নয়।

স্বাধীনতার ৭৮ বৎসর পরও আমাদের দেশের সর্বশেষ লোকসভা নির্বাচনে ৫৪৩ জন নির্বাচিত সাংসদের মধ্যে ৭৪ জন মহিলা সাংসদ যা মোট সাংসদের মাত্র ১৩.৬৩ শতাংশ। ১৯৯৬ সালে দেবগৌড়ার প্রধানমন্ত্রীত্বকালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের সময় বাম সাংসদ গীতা মুখার্জীর সংসদে উত্থাপিত মহিলা বিল অনেকটা টালবাহানার পর সংসদের উভয় কক্ষে পাশ হতে ২৭ বছর পার হয়েছে। যদিও সংসদে ৩৩ শতাংশ মহিলা সাংসদের সংরক্ষণ বিল এখনও কার্যকরী হয়নি। অথচ পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার ১৯৮৮ সালেই রাজ্যের লোকাল বডি নির্বাচনে মহিলাদের ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণ নিশ্চিত করে ও ২০১০ সালে ৫০ শতাংশে উন্নীত করার সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। নয়া উদারীকরণ নীতি দেশের কর্মসংস্থানে কোনো ইতিবাচক পদক্ষেপ ফেলতে পারেনি। বেকার সংখ্যা অতীতের সমস্ত সংখ্যাকে অতিক্রম করে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। তবে এই সময়কালে সংখ্যাতত্ত্বের ভিত্তিতে নারী শ্রমিকের সংখ্যা কিছুটা হলেও বৃদ্ধি পেয়েছে। আবার বিপরীতে ভারতে লিঙ্গভিত্তিক কর্মসংস্থানের উপর ৭ মার্চ, ২০২৫ প্রকাশিত রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে দেশে এখনও ৮ কোটি ৯০ লক্ষেরও বেশি শহুরে মহিলাই ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে শ্রমের বাজারের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেননি। সমকাজে সম মজুরি আইন পাশ হওয়া সত্ত্বেও লিঙ্গ বেতন বৈষম্য বিদ্যমান। আমাদের রাজ্য প্রশাসনেও সব লিঙ্গ নির্বিশেষে চুক্তি প্রথার কর্মচারীদের ক্ষেত্রে এই বেতন বৈষম্য চলছে।

নারী শ্রমিকরা এখনও কম মজুরিতে কাজ করেন। খেতমজুর, ইটভাঁটা, নির্মাণ শ্রমিক সহ বহু ক্ষেত্রে নারী শ্রমিকদের গড় মজুরি পুরুষ শ্রমিকদের

গড় মজুরি থেকে কম। শিল্পে আধুনিকীকরণের নামে যখন কর্ম সঙ্কোচন হয়, তখন অদক্ষ শ্রমিকের 'তকমা' দিয়ে নারী শ্রমিকদেরই সবার প্রথম ছাঁটাই করা হয়। আমাদের দেশে ৯৪ শতাংশ শ্রমিক অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মরত। আবার অসংগঠিত ক্ষেত্রে মোট শ্রমিকের ৪৩ শতাংশ নারী শ্রমিক যারা কম মজুরি ও শ্রমের মর্যাদাহীন কাজে যুক্ত। একটা বড়ো অংশ চুক্তি প্রথার শ্রমিক। নয়া উদারবাদী নীতির অন্যতম প্রধান শর্ত হায়ার এন্ড ফায়ার, ট্রেড ইউনিয়ন মুক্ত শিল্প। সমাজে অর্থনৈতিক দারিদ্র্যতার সুযোগে দেশে নারী পাচারের সংখ্যাও ক্রমবর্ধমান। ভারতে প্রতি বছর লক্ষাধিক নাবালিকা দেহ ব্যবসায় যুক্ত হচ্ছে, গৃহ পরিচারিকার কাজ নিয়ে বিদেশে পাড়ি দিচ্ছেন বা দেশের অভ্যন্তরেই পরিযায়ী হচ্ছেন শিক্ষিত মহিলারা, গার্হস্থ্য হিংসা বন্ধে আইন পাশ হলেও গার্হস্থ্য নির্যাতনের শিকারে মহিলা ও শিশুর সংখ্যা ঊর্ধ্বমুখী, অর্থের বিনিময়ে নারীরা 'পণ্য' হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছেন। কন্যা ভ্রূণ হত্যা, পণ বা যৌতুকের কোনো কোনো ক্ষেত্রে চরিত্র বদলালেও ঐ সামাজিক ব্যাধি থেকে এখনও আমরা মুক্ত হতে পারিনি।

কর্মক্ষেত্রে নারীদের নিরাপত্তার অভাব ও সামাজিক সুরক্ষা বিহীন কাজের ফলস্বরূপ সংগঠিত ও অসংগঠিত উভয় ক্ষেত্রেই নারীরা যৌন লাঞ্ছনার শিকার। ১৯৯২ সালে রাজস্থানে নারী উন্নয়ন প্রকল্পের এক সরকারী মহিলা কর্মী ভানোয়ারী দেবী একটি ৯ বছরের নাবালিকার বিয়ে আটকানোর চেষ্টার প্রেক্ষিতে গ্যাং-রেপের শিকার হন। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা নিম্নবর্ণের মহিলাকে স্পর্শ করতে পারে না—এই বিচিত্র যুক্তিতে আদালত অভিযুক্তদের রেহাই দেয়। ১৯৯৭ সালে বিভিন্ন মহিলা গোষ্ঠীর তৈরি বিশাখা মঞ্চ রাজস্থান সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করে সুপ্রিম কোর্টে। সুপ্রিম কোর্টের তরফে ভারতবর্ষে কর্মক্ষেত্রে যৌন হেনস্থার বিরুদ্ধে প্রথম বিশাখা নির্দেশিকা প্রকাশিত হয়। ২০১৩ সালে দিল্লীর 'নির্ভয়া' কাণ্ডের পর ভারত সরকার কর্মক্ষেত্রে ও শিক্ষাক্ষেত্রে যৌন হেনস্থা রুখতে বিশাখা গাইড লাইনকে নির্ভর করে প্রথম 'পশ আইন' পাশ করে এবং ২০১৫ সালে UGC শিক্ষা ক্ষেত্রে ICC (Internal complaint Committee on sexual Harrassment) কমিটি তৈরির নির্দেশ দেয়।

কর্মক্ষেত্র নারীদের সুরক্ষাহীনতাকে বে-আব্রু করে দেয় গত বছরের আগস্ট মাসের আর জি কর-এর ঘটনা। একজন তরুণী চিকিৎসক-পড়ুয়া সরকারী হাসপাতালে কর্মরত অবস্থায় কর্মস্থলে সরকারী নিরাপত্তা বেষ্টনীতে সহকর্মীর দ্বারা পৈশাচিক অত্যাচারিত হয়ে খুন হলেন। যা একটি বিরলতম ঘটনা। জনমানসের তীব্র ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটে—১৪ আগস্ট '২৪-এর মধ্য রাতে। এন আর সি বিরোধী আন্দোলনে শাহিনবাগ সহ দেশজুড়ে মহিলাদের আন্দোলনকে স্মরণ রেখেই বলা যায় ১৪ আগস্ট মহিলাদের 'নারী বিস্ফোরণ' দুনিয়াজুড়ে মানুষের ঘুমন্ত চেতনাকে জাগ্রত করেছে, সজাগ করেছে, উন্নীত করেছে। অভয়ার বিচারের দাবিতে দীর্ঘস্থায়ী এই আন্দোলনে যে সৃষ্টিশীল শ্লোগান-গান-আবৃত্তি-গ্রাফিতি সহ বিভিন্ন রূপ ও ভাবনার উপস্থাপন হয়েছে তাতে প্রগতিশীল সংস্কৃতির পুনর্জাগরণ ঘটেছে। যদিও আন্দোলনের আঁচ প্রত্যন্ত গ্রাম-গঞ্জে প্রবাহিত করার ক্ষেত্রে কিছু দুর্বলতা ছিল, তবুও আগামী দিনে শাসকের বিরুদ্ধে 'Manufacturing of consent' তৈরীতে এই আন্দোলন সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। কবির ভাষায় 'বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে'। আর জি কর-এর ঘটনায় আদালত সাজা ঘোষণা করলেও অভয়ার মা ও বাবা এবং জনগণ প্রকৃত দোষীর শাস্তির দাবিতে সঠিক বিচারের আশায় রাস্তাতেই রয়েছেন। আমাদের সংগঠনও প্রথম দিন থেকেই 'জাস্টিস'-এর দাবিতে রাস্তায় ছিল, আগামীতেও 'জাস্টিসের' দাবিতে অভয়ার মা-বাবার সাথে রাস্তাতেই থাকবে। অভয়ার বিচারের দাবিতে আন্দোলন চলাকালীন আমাদের সংগঠন রাজ্যজুড়ে প্রশাসনে 'বিশাখা আইন' কার্যকর করার দাবিতে কর্মস্থলে প্রশাসনের নিকট ডেপুটেশন ও প্রশাসনে কর্মচারীদের সচেতন করতে কর্মসূচী গ্রহণ করে, যা বর্তমান আন্দোলন সংগ্রামে এক নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে।

আমাদের দেশ ও রাজ্যের নারী সম্ভ্রম আজ বিপন্ন। একদিকে দেশজুড়ে লাভজিহাদ, ঘর ওয়াপসি, উন্নাও, হাথরস, বিলকিসবানুর মতো অসংখ্য ঘটনার সাক্ষী, অপরদিকে পার্কস্ট্রীট, কামদুনি, মধ্যমগ্রাম, কাটোয়া হয়ে সম্প্রতি হাঁসখালি, আর জি কর, কুলতুলি, নদীয়া, শাহজাহানের সন্দেশখালি নামের তালিকা দীর্ঘতর হবে। নারীরা ধর্ষিতা হচ্ছেন, খুন হয়েছেন, পুড়িয়ে মারা, বিষ খাইয়ে মারার মতো ঘটনা ঘটছে। কেন্দ্রের সরকার 'বেটি বাঁচাও-বেটি পড়াও' গাল ভরা শ্লোগান শোনাচ্ছেন, আর রাজ্যের সরকার ধর্ষিতা নারীদের বয়স অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ ধার্য করছেন। কিন্তু অভিযুক্তদের কঠোর সাজা হচ্ছে না। আর জি কর-এর ঘটনার পর রাজ্যের মাননীয়া মহিলাদের রাতের শিফটে কাজ বন্ধের ফতোয়া দিলেন, যেন রাতটা শুধু পুরুষদের। সেই ফতোয়া জনরোষে বাতিল হয়েছে। সম্প্রতি যাদবপুরে এক ছাত্রের শিক্ষামন্ত্রীর গাড়ি চাপা পড়ার ঘটনায় মেদিনীপুরের প্রতিবাদের গ্রেপ্তার ছাত্রীদের উপর পুলিশি হেফাজতে অবর্ণনীয় পুলিশি অত্যাচারের ঘটনা আদালতের বিচারাধীন।

রাজ্যজুড়ে একদিকে নারীদের 'ইজ্জত' লুট হচ্ছে, অপরদিকে সেই নারীদের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী প্রকল্পে নগদ অর্থ প্রদান করে স্ব-নির্ভর করার পরিকল্পনা করা হচ্ছে, যদিও প্রচার আছে প্রকল্পগুলি ক্ষোভ সামাল দিতে ও ভোট ব্যাঙ্ক সুরক্ষিত রাখার পরিকল্পনা। ইনফোসিস ও এল এন্ড টি-র দুই শিল্পকর্তা যখন শ্রমিকদের সপ্তাহে ৭০ ঘণ্টা ও ৯০ ঘণ্টা কাজ করার নিদান দেন, তখন স্বভাবতই শ্রমিক অসন্তোষ তীব্র হয়; আবার এই ব্যবস্থাতেই আমাদের দেশে গৃহ কর্মে নিযুক্ত নারীরা পারিবারিক কাজে সপ্তাহে ৮০-৯০ ঘণ্টা বিনা মজুরিতে শ্রম দিচ্ছেন। এই বিপুল পরিমাণে বিনা মজুরিতে ব্যয়িত শ্রম দেশের জিডিপি-তে যুক্ত হয় না। তাই নগদের অর্থ প্রদানের মধ্য দিয়ে নারীদের অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর করার প্রয়াসের দৃষ্টিভঙ্গী ইতিবাচক। যদিও নগদে এই অর্থ প্রদানের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করা দরকার। কিন্তু কিছু প্রশ্ন জনমানসে জাগছে—রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো যদি শক্তিশালী থাকতো, তবে কি মেদিনীপুর হাসপাতালে সন্তান প্রসবা মায়েদের স্যালাইন বিষকাণ্ডে অঘোরে প্রাণ দিতে হত? নিউটাউনে রাস্তার মোড়ে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা থাকলে, নাবালিকা কন্যাশ্রীকে অন্ধকারে ধর্ষিতা হয়ে খুন হতে হত? এরকম বহু উদাহরণ আছে। এখন রাজ্যের রাজস্ব আদায়ের ভর কেন্দ্র সুরা বিক্রি থেকে প্রাপ্ত কর। অপরদিকে আট হাজারের বেশি স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে। শিক্ষক নেই, পরিবারে আয়ের সংস্থান নেই। কেন বিপুল বিজ্ঞাপিত কন্যাশ্রী প্রকল্পে বর্তমান অর্থবর্ষে বাজেট বরাদ্দ ৪১ শতাংশ হ্রাস পেল? কেন ২০২৩ সালে মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রীদের সংখ্যা থেকে ২০২৫ সালে উচ্চমাধ্যমিকে ছাত্রী পরীক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৬৫ হাজার কমে গেল? কেন ছাত্রীদের স্কুলে ড্রপ আউট বৃদ্ধি পাচ্ছে? সম্প্রতি একটি সমীক্ষায় প্রকাশিত, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় গত এক বৎসরে ১০,৭৫৫টি নাবালিকার গর্ভপাত করা হয়েছে। রাজ্যে নাবালিকা বিবাহের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ কী? কেন কন্যাশ্রী প্রাপক ২ লক্ষ কমে গেল। এইজন্যই কি লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের বাজেট বৃদ্ধি দ্বিগুণ হলেও রূপশ্রীর বরাদ্দ একই রয়ে গেল? সমাজ এই সকল প্রশ্নের উত্তর চায়।

দেশের স্বাধীনতা অর্জনে ভারত ভাবনার মর্মবস্তু ছিল ধর্মনিরপেক্ষ, বহুত্ববাদ, গণতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র। এই ভারত ভাবনাকে রক্ষার ভিত্তি অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, যুক্তিবাদ, বিজ্ঞানের প্রসার ও বৈজ্ঞানিক মেজাজ বা বিজ্ঞান মনস্কতা। কিন্তু দীর্ঘকালের বহমান সামাজিক ব্যাধি, জাত বৈষম্য, কুসংস্কার, কুপমণ্ডুকতা সমানে বিদ্যমান ছিল। রাষ্ট্রের পরিচালকগণ রাষ্ট্র ও ধর্মকে পৃথক না করে 'সর্ব ধর্ম সমন্বয় নীতি' গ্রহণ করায় ধর্মনিরপেক্ষতার মূল ভাবনাকে দুর্বল করা হল। দেশের উগ্র দক্ষিণপন্থী শক্তি ধর্মবিশ্বাসীদের মধ্যে থাকা সুপ্ত সাম্প্রদায়িকতাকে জাগ্রত করে অবচেতন মননে সাম্প্রদায়িকতার বিষ-বাষ্পকে প্রবর্তন (Inject) করছে। এক বিপুল সংখ্যার নারী সমাজও এর প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। হিংস্র সাম্প্রদায়িকতার মোকাবিলায় আমাদের স্মরণ করতে হবে দেশের ধর্ম-শিক্ষা-সমাজ সংস্কারকদের। বিদ্যাসাগর মহাশয় পরাশর সংহিতা ধর্মগ্রন্থ থেকে শ্লোক বিশ্লেষণ করে বিধবা বিবাহের পক্ষে যুক্তি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, বিবেকানন্দ শিকাগো বিশ্ব ধর্মসংসদে হিন্দু ধর্মের সহিষ্ণুতার কথা তুলে ধরেছিলেন, রামকৃষ্ণ বলেছিলেন যত মত তত পথ, রামমোহন, রবিঠাকুর, জ্যোতিরাও ফুলে, সাবিত্রী বাঈ ফুলেদের লেখা-ভাবনা তুলে ধর্মবিশ্বাসীদেরও ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে লড়াইয়ে যুক্ত করতে হবে।

স্বাধীনতা আন্দোলনে জীবন-পণ লড়াইয়ে নারীদের অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। চিকিৎসা, বিজ্ঞান, গবেষণা, খেলাধূলা সহ সমস্ত ক্ষেত্রে নারীদের সাফল্য দেশকে গর্বিত করে। সর্বশেষ উদাহরণ মহাকাশচারী ভারতীয় বংশোদ্ভূত সুনীতা উইলিয়ামস। আমাদের সংগঠনেও নারীদের অংশগ্রহণ ও সংগ্রাম আমাদের উদ্বুদ্ধ করে। বিশেষত ২০১১ সালের পরবর্তী সময়ে অন্যান্য পুরুষ কর্মচারীদের সঙ্গে নারীরাও প্রশাসনের অভ্যন্তরে হুমকি সংস্কৃতি ও রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে সমস্ত রকম প্রতিকূলতাকে মোকাবিলা করছেন, মহিলা কর্মচারীরা জেল খেটেছেন, দূর-দূরান্তরে বদলি হয়েছেন, বদলি অবস্থায় দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়েছেন কিন্তু আত্মসমর্পণ করেননি। সংগঠনে-সমিতিতে যখন যে দায়িত্ব পেয়েছেন দক্ষতার সাথেই সেই দায়িত্ব পালন করছেন। আগামী দিনেও বিভাজনের শক্তির বিরুদ্ধে, স্বৈরাচারী ও দুর্নীতিগ্রস্ত শক্তির অপশাসনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ভারসাম্য পরিবর্তনের সংগ্রামে নারীরা পুনরায় ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করবেন। □

দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পরে

রাজ্য কাউন্সিল সভার আহ্বান

মধ্যে ব্লকস্তর পর্যন্ত প্রচার কর্মসূচী সংগঠিত হবে। অবস্থান কর্মসূচীর দাবিসনদ যৌথ মঞ্চের অন্তর্ভুক্ত সংগঠনকে যুক্ত করে ব্যাপক জমায়েত করতে হবে। নির্দিষ্ট এলাকার বৈশিষ্ট্যকে মাথায় রেখে জেলা ভিত্তিক ২টি দাবি যুক্ত করা যেতে পারে।

বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচী ঃ (১) রাজ্যের শ্রমিক-কৃষক সহ সব অংশের মেহনতী মানুষের আহ্বানে আগামী ২০ এপ্রিল ২০২৫ ব্রিগেড সমাবেশ সফল করার মাধ্যমে দাবি আদায়ের ইতিবাচক বাস্তবতা তৈরি করতে হবে।

(২) কর্পোরেট স্বার্থবাহী কেন্দ্রের সরকার সংগঠিত শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থহরণকারী শ্রমকোড কার্যকরী করতে উদ্যত। এর বিরুদ্ধে সর্বভারতীয় সংগঠন ও ফেডারেশনসমূহের যৌথ কনভেনশন আগামী ১৮ মার্চ ২০২৫ দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হবে। এই কনভেনশন থেকে কর্পোরেট স্বার্থবাহী শ্রমকোড বাতিলের দাবিতে দেশব্যাপী সর্ববৃহৎ আন্দোলন সংগঠিত করতে প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। তদ্‌সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকারের অনড় অবস্থান থাকলে মে মাসের প্রথম সপ্তাহে দেশব্যাপী ধর্মঘটের পথে যেতে বাধ্য হবে শ্রমজীবী জনগণ। ট্রেড ইউনিয়ন রক্ষার স্বার্থে সর্বোপরি কর্মচারীদের অর্জিত গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার স্বার্থে রাজ্য প্রশাসনকে স্তব্ধ করে দেওয়ার প্রস্তুতি আমাদের গ্রহণ করতে হবে।

(৩) আগামী ২২-২৩ মার্চ, ২০২৫ তারিখে ১২ই জুলাই কমিটির কেন্দ্রীয় কমিটির সভা থেকে গৃহীত সিদ্ধান্ত কার্যকরী করতে হবে।

শিক্ষামূলক কর্মসূচী ঃ জেলা/অঞ্চল/সমিতি'র স্তরে মার্চ ২০২৫ মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের কর্মসূচী সমাপ্ত করতে হবে।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস ১ মে ২০২৫ যথাযথ মর্যাদায় পালন করতে হবে। মে দিবসকে কেন্দ্র করে আলোচনা সভা করতে হবে। **আলোচনার বিষয় ঃ উগ্র দক্ষিণপন্থার ক্রমবর্ধমান বিপদ ও শ্রমজীবী ঐক্যের গুরুত্ব।**

সাংস্কৃতিক কর্মসূচী ঃ (১) বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক ঋত্বিক ঘটক ও কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন করতে হবে।

(২) এলাকার জনজাতি বিন্যাস অনুযায়ী উপযুক্ত সাংস্কৃতিক কর্মসূচী রূপায়ণ করতে হবে।

চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীদের বিষয়ে করণীয় ঃ বিংশতিতম রাজ্য সম্মেলনে চুক্তির কর্মচারীদের পৃথক সংগঠন গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি সমিতি এই বিষয়ে সাংগঠনিক প্রক্রিয়া গ্রহণ করলেও চূড়ান্ত রূপ দেওয়া সম্ভব হয়নি। আসন্ন রাজ্য সম্মেলনের পূর্বে তা সম্পন্ন করতে হবে। সমিতিগুলিকে জেলা/অঞ্চল কো-অর্ডিনেশন কমিটির সহযোগিতায় এ বিষয়ে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।

সমিতির সংযুক্তিকরণ সংক্রান্ত ঃ নতুন কর্মচারী নিয়োগ না হওয়া এবং প্রশাসনিক কাঠামোর অভ্যন্তরে পরিবর্তন জনিত কারণে কয়েকটি সমিতির সংযুক্তিকরণ অবশ্যম্ভাবী। ক্ষেত্রবিশেষে কয়েকটি সমিতির কেন্দ্রীয় স্তরে দুর্বলতা বিরাজ করলেও জেলাস্তরে কর্মী-নেতৃত্ব অবস্থান করছেন। এক্ষেত্রে সমিতি ও জেলা সংগঠনের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব আগামী এপ্রিল ২০২৫ মাসের মধ্যে কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে প্রেরণ করা প্রয়োজন। সংযুক্তিকরণের প্রস্তাবনায় নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় বিচার্যের মধ্যে রেখে সংশ্লিষ্ট সমিতির প্রস্তাবনা প্রেরণ করা প্রয়োজন—(১) মোট কর্মচারীর সংখ্যা (২) মোট সদস্য সংখ্যা (৩) কাঠামোগত অবস্থান (৪) কর্মরত কর্মী-নেতৃত্বের সংখ্যা (৫) প্রশাসনিক কাজের ধরণ (৬) সংযুক্তিকরণের কারণ (৭) কোন কোন জেলায় সাংগঠনিক কাঠামো সক্রিয় (৮) অন্যান্য।

সোশ্যাল মিডিয়া : ইতিপূর্বে সোশ্যাল মিডিয়াকে সঠিকভাবে ব্যবহারের কেন্দ্রীয় টিম এবং জেলা ভিত্তিক গ্রুপ গঠিত হয়েছে। জেলা থেকে Feedback দেওয়া প্রয়োজন। আগামী আন্দোলনের কর্মসূচী সর্বত্র প্রচারের লক্ষ্যে ২০ মার্চ ২০২৫ সন্ধ্যা ৬.৩০ মিঃ সামাজিক মাধ্যমে সভা হয়। জেলা ও সমিতির সোশ্যাল মিডিয়া গ্রুপে যুক্ত কমরেডরা এই সভায় যুক্ত হয়েছিলেন।

সামাজিক দায়বদ্ধতার কর্মসূচী ঃ জেলা/অঞ্চল/সমিতিকে সামাজিক দায়বদ্ধতার কর্মসূচী রূপায়ণ করতে হবে। আগামী ১২ জুলাই, ২০২৫ তারিখে ১২ই জুলাই কমিটির প্রতিষ্ঠা দিবসের কর্মসূচী রূপায়ণ ও কর্মচারী ভবনে কেন্দ্রীয় রক্তদান কর্মসূচী হবে। অঞ্চল ও সমিতির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বদের সাংগঠনিক উদ্যোগ গ্রহণ করে রক্তদাতাদের তালিকা কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে প্রেরণ করতে হবে।

পেনশনার্স সমিতির সহযোগিতায় সংগঠনের উদ্যোগে প্রান্তিক মানুষের স্বার্থে বিকল্প স্কুলের ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

সর্বভারতীয় সংগঠনের কর্মসূচী ঃ আগামী ২৭-২৮ এপ্রিল, ২০২৫ সর্বভারতীয় সংগঠনের জাতীয় কার্যনির্বাহী সভা থেকে গৃহীত সিদ্ধান্ত রূপায়ণ করতে হবে।

সর্বভারতীয় সংগঠনের ১৮তম জাতীয় সম্মেলন মহারাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত হবে। ডিসেম্বর, ২০২৫ মাসের শেষ সপ্তাহে জাতীয় সম্মেলন হওয়ার সম্ভাবনা। সেইমতো প্রতিনিধি নির্ধারণ করে সম্মেলনে উপস্থিতি স্থির করতে হবে।

একবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন ঃ বর্তমান সাংগঠনিক বছর সংগঠনের সম্মেলনের বছর। সংগঠনের একবিংশতম রাজ্য সম্মেলন আগামী ১০-১২ জানুয়ারি ২০২৬, নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে হবে। নতুন উদ্যোগে, নতুন উদ্যমে আগামী দিনের আন্দোলন-সংগ্রাম ও কঠিন লড়াইয়ের জন্য সর্বস্তরের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন করতে—

ব্লক সম্মেলন ঃ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে অক্টোবর, ২০২৫ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে (অর্ধদিবস ছুটি নিয়ে) সম্পন্ন করতে হবে। সংগঠনকে শক্তিশালী করতে প্রতিটি ব্লকে কাঠামো পুনর্গঠনের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে।

মহকুমা সম্মেলন ঃ নভেম্বর, ২০২৫ মাসের মধ্যে (ছুটির দিন বা পূর্ণ দিবস ছুটি নিয়ে) শেষ করতে হবে।

জেলা/অঞ্চল সম্মেলন ঃ ডিসেম্বর, ২০২৫ মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে।

সমিতির সম্মেলন ঃ বর্তমান সাংগঠনিক বছরে কয়েকটি অন্তর্ভুক্ত সমিতির রাজ্য সম্মেলন আছে। সংগঠনের রাজ্য সম্মেলনের সাথে নির্দিষ্ট ব্যবধান রেখে সমিতির রাজ্য সম্মেলনের নির্ঘণ্ট নির্ধারণ করতে হবে।

তহবিল সংক্রান্ত ঃ সংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে সম্মেলনকে সফল করতে প্রতিটি কর্মচারীর কাছে পৌঁছে জুলাই-আগস্ট, ২০২৫ মাসের বেতন থেকে তহবিল সংগ্রহ করতে হবে। একাধিক কুপন সংগ্রহ করা যাবে।

তহবিলের হার ঃ মোট বেতন ৪০০০০ টাকা পর্যন্ত—১০০ টাকা

মোট বেতন ৪০০০১-৬০০০০ টাকা—২০০ টাকা

মোট বেতন ৬০০০১ এবং তদূর্দ্ধে—৩০০ টাকা

ফ্যামিলি পেনশনার্সদের ক্ষেত্রে ৫০ টাকা এবং রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের ৫০০ টাকা। মোট সংগৃহীত তহবিল বণ্টনের হার জেলা ঃ কেন্দ্র ৮০ : ২০ অনুপাতে।

পত্র-পত্রিকা ঃ সংগ্রামী হাতিয়ার ও এমপ্লয়িজ ফোরামের গ্রাহকভুক্তি সংগ্রহে পরিকল্পনা করে বৃদ্ধি করার প্রয়াস নিতে হবে। মুখপত্র নিয়ে কয়েকটি জেলা নিয়মিত পাঠচক্র সভা করে থাকে। এই প্রয়াস অভিনন্দনযোগ্য। এই প্রচেষ্টা সকল সমিতি/জেলাকে গ্রহণ করতে হবে।

নয়া উদার অর্থনীতির আগ্রাসী চরিত্র এবং সাম্প্রদায়িক বিভাজন ও মৌলবাদী তৎপরতার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে। পাশাপাশি অর্জিত অধিকার রক্ষা এবং প্রশাসনিক সন্ত্রাস ও চরম আর্থিক বঞ্চনার বিরুদ্ধে সমস্ত কর্মচারী সমাজকে সাথে নিয়ে বৃহত্তর সংগ্রামে জয়ী হওয়ার লক্ষ্যে ব্রতী হওয়া এবং তৎপরবর্তীতে সম্মেলন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সাংগঠনিক কাঠামোর পুনর্গঠনে সর্বাধিক সাংগঠনিক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। পথ বন্ধুর, পথ কঠিন। কিন্তু অলীক নয়। শ্রমিক-কর্মচারী স্বার্থবাহী নিয়োগকর্তা নির্ধারণে সাংগঠনিক কাঠামোকে সচল করে কর্মচারী ও তার পরিবারের সাথে নিবিড় সংযোগ গড়ে তুলতেই হবে। রাজ্য কাউন্সিল সভার বিশেষ অধিবেশনে আলোচনা সভার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সঠিক দিশা দেখানোর দায়িত্ব আমাদের। এটা সময়ের দাবি। এই চ্যালেঞ্জ নিয়েই আগামী দিনে সংগঠন-সংগ্রাম-আন্দোলন পরিচালনা করতে হবে। □

ইন্দ্রজিৎ রায় চৌধুরী

তৃতীয় পৃষ্ঠার পরে

২০ মে দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট

পাশাপাশি প্রশাসনের অভ্যন্তরে প্রশাসনিক কাঠামোকে ব্যবহার করে এবং বাইরে থেকে যে ধরনের আক্রমণের ধারাকে সমাজ জীবনের সর্বদিকে সংহত করা হয়েছে এবং প্রতিনিয়ত নিত্য নতুন কায়দায় সংহত করা হচ্ছে, তার সাথে ফ্যাসিস্ট আক্রমণের যথেষ্ট মিল রয়েছে। প্রশাসনিক স্তরে নানান আদেশনামা জারির মাধ্যমে গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের পাশাপাশি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সর্বোপরি সমাজের সর্বক্ষেত্রে অধিকার ও সামাজিক মূল্যবোধের উপর আক্রমণ আসলে ফ্যাসিস্ট সুলভ মতাদর্শের বৈশিষ্ট্য। তাই শুধুমাত্র কর্মচারী আন্দোলন নয়, পশ্চিমবাংলা তথা ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সামনে সমস্যা হচ্ছে ফ্যাসিস্ট সুলভ আক্রমণকে প্রতিহত করে সংগামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। সংগ্রামের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করা। যৌথ আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি করা। বর্তমানে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে হিংস্র আক্রমণ নেমে আসছে, সেক্ষেত্রে শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে Unity in action-কে জীবন্ত করে বৃহত্তর আন্দোলনের সাথে সাযুজ্য রেখে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়। এর পূর্ব শর্ত হচ্ছে মিছিল, মিটিং, আদায়যোগ্য দাবি নিয়ে বিভিন্ন কর্মসূচী রূপায়ণের পাশাপাশি কর্মচারীদের কাছে পৌঁছে তাদেরকে সদস্য করা। সাংগঠনিক কাজে যুক্ত করার মধ্য দিয়ে চেতনাকে উন্নত করা। অনেক সময় আমরা এই প্রাথমিক পর্যায়ের কর্মসূচীগুলিকে যথাযথ গুরুত্ব না দিলেও শাসকশ্রেণী গুরুত্ব দেয়। কর্মচারীরা যাতে প্রাথমিক পর্যায়ের কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে সংগঠিত হতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখেই প্রশাসনিক আক্রমণ চালানো হয়। সুতরাং আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে সমস্ত ধরনের আন্দোলনের কর্মসূচীকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে রূপায়ণ করাই প্রাথমিক দায়িত্ব। যে কোনো ধরনের আক্রমণের বিরুদ্ধে আন্দোলন জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে সর্বস্তরের শ্রমিক-কর্মচারী তথা সর্বস্তরের শ্রমজীবী মানুষের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে। শ্রমিক-কর্মচারীর অর্জিত অধিকার রক্ষার সংগ্রামের পূর্বশর্ত অধিকার রক্ষার গণতান্ত্রিক বাতাবরণ তৈরি করা।

সেই লক্ষ্যেই রাজ্য কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত শ্রমিক কর্মচারী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের যৌথ মঞ্চের আহ্বানে কেন্দ্রীয় ৭ দফা ও জেলাগত ২ দফা দাবিকে যুক্ত করে ৭-৯ এপ্রিল ২০২৫ প্রতিটি মহকুমায় অবস্থান কর্মসূচী করবেন রাজ্যের শ্রমিক-কর্মচারীরা।

অবস্থান কর্মসূচীর দাবিসমূহ ঃ

১। কেন্দ্রীয় হারে প্রাপ্ত ৩৫ শতাংশ বকেয়া মহার্ঘভাতা / মহার্ঘ রিলিফ অবিলম্বে প্রদান করতে হবে। অবসরকালীন পেনশন কমিউটেশনের অর্থ ১০ বছর ৮ মাসে ফেরত পাওয়ার আদেশনামা প্রকাশ করতে হবে।

২। সপ্তম বেতন কমিশন গঠন করতে হবে।

৩। স্বাস্থ্য পরিষেবা সহ সমস্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে দুর্নীতি ও 'থ্রেট কালচার' মুক্ত করতে হবে। ধর্মঘটের অধিকার সহ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারকে সুরক্ষিত রাখতে হবে।

৪। রাজ্য প্রশাসন পরিচালিত সমস্ত প্রতিষ্ঠানের শূন্যপদগুলিতে স্বচ্ছ পদ্ধতিতে স্থায়ী নিয়োগ করতে হবে। সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের নির্দেশিকাকে মান্যতা দিয়ে চুক্তিভিত্তিক / অনিয়মিত কর্মচারী ও শিক্ষকদের নিয়মিতকরণ করতে হবে।

৫। এযাবৎকাল প্রকাশিত সমস্ত হয়রানিমূলক, প্রতিহিংসাপরায়ণ ও আইন বহির্ভূত বদলির আদেশনামা প্রত্যাহার করে, সংশ্লিষ্ট কর্মচারী ও শিক্ষকদের পূর্ববর্তী স্থানে ফিরিয়ে আনতে হবে।

৬। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-র অনুকরণে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা পরিকাঠামোকে ক্রমান্বয়ে দুর্বল করার পরিকল্পনা বাতিল করতে হবে।

৭। রাজ্যে সর্বনাশা বিভাজনের রাজনীতি বন্ধ করে গণতন্ত্র ও সম্প্রীতির বাতাবরণ সুনিশ্চিত করতে হবে।

আসুন, অর্জিত অধিকার রক্ষার দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলি। এই আন্দোলন আগামীতে একদিন, দুইদিন বা তিনদিনের কর্মসূচীর মধ্যে আবদ্ধ থাকবে না। আন্দোলন চলবে নিরন্তর। গায়ে-গতরে খাটা দরিদ্র মানুষ যখন আন্দোলনের সর্বোচ্চ হাতিয়ারকে প্রয়োগ করতে চান, তখন মধ্যবিত্ত কর্মচারী সমাজ সেই লড়াইয়ের বাইরে থাকতে পারে না। সর্বত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলাই সময়ের চাহিদা। সেই প্রতিরোধধর্মী সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে। □

চতুর্থ পৃষ্ঠার পরে

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

টাকায় ক্যাম্পাসে অশালীন সংস্কৃতির দেদার আমদানি শুরু হয়। ছাত্র সমাজের নিরাপত্তা রক্ষার ছাত্র সংসদ পরিণত হয় ছাত্র সমাজের নিরাপত্তাহীনতার আখড়ায়। ক্যাম্পাসের গণতান্ত্রিক চেতনা নষ্ট করে কর্পোরেটের খেয়ালখুশিমতো মূল্যবোধে ছাত্র মনন পর্যবসিত করার অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা সক্ষম হয় ক্যাম্পাসে। যার অনুষঙ্গেই জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ প্রয়োগের ভিত্তিভূমি প্রস্তুত হয়।

এই মুহূর্তে দেশের উচ্চশিক্ষার অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ প্রতিষ্ঠান যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে সবচেয়ে খারাপ আর্থিক সংকটের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। ২০১৭ সাল থেকে কেন্দ্রীয় অনুদান বন্ধ এবং গত কয়েক বছরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বাজেট কমিয়ে দেওয়ার ফলে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার কাজ এবং প্রকল্পগুলি, যার জন্য এটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত, মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এরকম একটি নামী বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ কোনও স্থায়ী উপাচার্য নেই। বিভিন্ন স্তরের কাউন্সিলগুলিতে কোনও নির্বাচনই হয়নি। সরকার মনোনীত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে চলছে দখলদারির প্রচেষ্টা। এতদ্‌সত্ত্বেও মাথায় রাখতে হবে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রেসিডেন্সি কলেজ ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় ক্ষেত্রে তাদের সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখে চলেছে। ২০১১ সালে বাংলায় পালাবদল আর ২০১৪ সালে দেশে মোদি রাজ শুরু হওয়ার পর এই বছরগুলিতে দেশ ও রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অনেক কিছু বদলেছে। দেশ ও রাজ্যের শাসক একটা ঘৃণার পরিবেশ তৈরী করছে প্রগতিশীল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে। ক্যাম্পাসের বাইরে সাধারণ মানুষের একটি অংশ জেএনইউ, প্রেসিডেন্সি, যাদবপুর, হায়দ্রাবাদ কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, পুণের ফিল্ম ইন্সটিটিউটের মতো দেশের সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সন্দেহ ও ঘৃণা নিয়ে দেখতে শুরু করেছে। এগুলোকে দেশদ্রোহীদের ঘাঁটি হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছে এবং এই অপপ্রচার জনমতকে প্রভাবিত করেছে। ২০১১ সাল থেকে বাংলার শাসক দল এবং ২০১৪ সাল থেকে ভারতীয় জনতা পার্টি ও আর এস এস-এর সংগঠনগুলি যাদবপুর বা জেএনইউ-এর বিরুদ্ধে শক্তিশালী অপপ্রচার শুরু করেছে। এদের ভাষ্য সম্পূর্ণ এক হয়ে যাচ্ছে সবক্ষেত্রে। এই অপপ্রচারের অভিযানে ব্যবহার হচ্ছে বড় মিডিয়া এবং এমনকি সিনেমা-সিরিয়ালও। এমনকি জেএনইউ-এর শিক্ষকরা চলচ্চিত্রে খলনায়কের চরিত্রে পরিণত হয়েছেন, তো কোথাও পড়ুয়াদের চরিত্র স্খলন করেছেন মোহন ভাগবত থেকে এরাজ্যের মদন মিত্রদের মতো নেতারা। পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে রাজনীতি করে করদাতাদের অর্থ নষ্ট করার অভিযোগ তুলে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। মৌলিক বিজ্ঞানের বিষয়গুলো, গবেষণা, সমাজবিদ্যা, সাহিত্যকে গুরুত্বহীন করে বাজারের চাহিদা মতো বিষয়গুলো চালু করতে জোর দিচ্ছে নয়া জাতীয় শিক্ষা নীতির রূপকাররা। ভারতের বৌদ্ধিক ও মনোজগতে আধিপত্য স্থাপন করার স্বপ্ন আর এস এস-এর বহুদিনের। সেখানে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে এস এফ আই সহ কিছু প্রগতিশীল, ধর্মনিরপেক্ষ বামপন্থী ছাত্র-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীরা এবং দেশের কিছু সেরা বিশ্ববিদ্যালয়। অতএব, এদের ধ্বংস করা বা দখল করা তাদের লক্ষ্য। বাংলার যাদবপুরে রাজ্যের শাসকদল যে লক্ষ্যে আক্রমণ নামিয়ে আনছে, গোটা দেশে নাগপুর-ওয়ালারা সেটাই করার ছকে আছে। রাজ্যের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে নির্বাচিত ছাত্র সংসদের দাবিতে, সুষ্ঠু পঠনপাঠনের দাবিতে যে বিক্ষোভ আন্দোলন, সেই আন্দোলনরত ছাত্রদের ওপর গাড়ি চালিয়ে আহত করার মতো ন্যক্কারজনক ঘটনার প্রতিবাদে শামিল হন সকল অংশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। গত ৫ মার্চ শ্রমিক,কর্মচারী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের যৌথ মঞ্চ ১২ই জুলাই কমিটির আহ্বানে ধর্মতলা থেকে কলেজ স্কোয়ার পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিলে শামিল হয়েছেন বহু কর্মচারী ও শিক্ষক। রাজ্যজুড়ে প্রতিবাদে শামিল হয়েছে বিভিন্ন ছাত্র, শিক্ষক সংগঠন, শামিল হয়েছেন কর্মচারীরাও।

রাজ্যজুড়ে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পালিত হয় সর্বাত্মক ছাত্র ধর্মঘট। গত ৯ মার্চ অভয়া মঞ্চের আহ্বানে আর জি কর কাণ্ডে ন্যায়বিচারের দাবিতে এবং যাদবপুরে ছাত্রদের উপর নির্মম আক্রমণের প্রতিবাদে মিছিলে শামিল হন সকল অংশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাফল্য, তার ঐতিহ্য অন্তর্নিহিত রয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসমাজ, তার ছাত্র-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের দীর্ঘদিনের গড়ে তোলা পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে। আজ সেই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েই দুর্বৃত্ত শাসকের ক্যাম্পাস-দখলের চেষ্টাকে প্রতিহত করতে হবে। অর্জিত স্বাধিকার ছিনিয়ে আনতে হবে। □

দীপঙ্কর বাগচী

সমসাময়িক ইউরোপ—প্রতিক্রিয়া ও প্রতিরোধ

বিগত বেশ কিছু বছর ধরেই সারা বিশ্বজুড়ে অতি দক্ষিণপন্থীদের দাপাদাপি লক্ষ করা যাচ্ছে। নব্য উদার অর্থনীতি যত গাড্ডায় পড়ছে, সারা পৃথিবীজুড়েই এই অতি দক্ষিণপন্থীদের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দাপট বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইউরোপে ফ্যাসীবাদ ও নাৎসীবাদের সূচনা হয়েছিল এবং তার ফলে সারা ইউরোপকে মূল্য চোকাতে হয়েছিল যুদ্ধ, বিপুল প্রাণহানি ও সম্পদের ধ্বংসের মধ্যে দিয়ে। তাই ইউরোপে অতি দক্ষিণপন্থীরা রাজনৈতিকভাবে একটা প্রান্তিক শক্তিতে পরিণত হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে। কিন্তু ১৯৯০-এর দশক থেকে অসুরক্ষিতভাবে ঋণ প্রদান করে কৃত্রিম চাহিদার বুদবুদ তৈরি করে যে অর্থনীতি চালু ছিল, ২০০৮ সালে সেই বুদবুদ ফেটে পড়তেই সারা পৃথিবীজুড়ে অর্থনৈতিক সঙ্কট তৈরি হয়। সেই সঙ্কট থেকে বিশ্ব-অর্থনীতি আজও বের হয়ে আসতে পারেনি। ফলে সারা বিশ্বেই সেই সঙ্কটের রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে অতি দক্ষিণপন্থীদের প্রভাব বাড়ছে। ফ্যাসীবাদের উৎসভূমি ইতালিতে অতি দক্ষিণপন্থীরা রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করেছে এবং নাৎসীবাদের জন্মভূমি জার্মানিতে অতি দক্ষিণপন্থীরা উল্লেখযোগ্যভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে, যা ভবিষ্যতের জন্য এক অশনিসংকেত বহন করে আনছে।

১৯২২ সালের ২৮ অক্টোবর মুসোলিনীর নেতৃত্বে 'ব্ল্যাকশার্ট'-রা রোম অভিযান করেছিল (March to Rome)। ফলে ইতালির রাজা ভিক্টর ইমানুয়েল-III পরিস্থিতির দোহাই দিয়ে মুসোলিনীকে প্রধানমন্ত্রী হতে আহ্বান জানান। ৩১ অক্টোবর মুসোলিনী ইতালির প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। এর মধ্য দিয়ে একজন উগ্র দক্ষিণপন্থী প্রথম ক্ষমতায় আসীন হয়েছিলেন, যা পরবর্তীতে সারা ইউরোপ জুড়ে উগ্র দক্ষিণপন্থীদের ক্ষমতায় আসার ক্ষেত্রে তীব্র উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। ঠিক ১০০ বছর পরে ২০২২ সালের অক্টোবরে ইতালির নব্য-ফ্যাসিস্ট দল ব্রাদার্স অব ইতালি (FdI), অন্য দুটি সহযোগী নব্য-ফ্যাসিস্ট দলকে নিয়ে নির্বাচন জিতে ইতালির রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করেছে। এ প্রসঙ্গে স্মরণে রাখতে হবে যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মুসোলিনী পরাস্ত ও নিহত হলেও আমেরিকা তার সাঙ্গপাঙ্গদের মুক্তি দেয় এবং তাদের দিয়ে 'ইতালিয়ান সোশ্যাল মুভমেন্ট' (MSI) পার্টি তৈরি করে ১৯৪৫ সালেই। এদের তৈরি করার পিছনে মূল উদ্দেশ্য ছিল সেই সময় ইতালির সব থেকে জনপ্রিয় পার্টি 'ইতালিয়ান কমিউনিস্ট পার্টি' (PCI)-কে প্রতিহত করা। সেই সময় পশ্চিম ইউরোপে সব থেকে শক্তিশালী কমিউনিস্ট পার্টি ছিল 'ইতালিয়ান কমিউনিস্ট পার্টি। এই MSI-এর সরাসরি উত্তরাধিকারী হল FdI, যার বর্তমান নেত্রী জর্জিয়া মেলোনি এবং অন্যতম জনপ্রিয় নেত্রী হল মুসোলিনীর নাতনি র‍্যাচেল মুসোলিনী। গতবারের ভোটে FdI পেয়েছিল মাত্র ৪ শতাংশ ভোট, যা এবারে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৬ শতাংশ, অন্য দুই সহযোগী 'লিগ পার্টি' পেয়েছে ৯ শতাংশ এবং 'ফোর্জা ইটালিয়া' পেয়েছে ৮ শতাংশ। ফলে পার্লামেন্টে আসনের নিরিখে এই নব্য-ফ্যাসীবাদী দলগুলি সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও, ভোটের নিরিখে সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়। মেলোনি মতাদর্শগতভাবে 'Great replacement theory'-তে বিশ্বাস করেন, যার মূল বক্তব্য হল আফ্রিকা এবং পৃথিবীর অন্যান্য অংশ থেকে আসা খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী নন এমন মানুষেরা সাদা চামড়ার মানুষদের ধীরে ধীরে অপসারিত করে দিচ্ছে। মেলোনি বলেছিলেন নৌবাহিনী দিয়ে লিবিয়াকে অবরুদ্ধ করবেন যাতে সেখান থেকে কোনও মুসলমান ইউরোপে ঢুকতে না পারেন। ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে গভীর সখ্যতা রয়েছে মেলোনির।

প্রণব কর

আমরা যদি সুইডেনের দিকে তাকাই তবে দেখবো ২০২২-এর আগস্ট মাসের নির্বাচনে সেখানে অতি দক্ষিণপন্থী দল 'সুইডেন ডেমোক্র্যাটস' দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। তারা সেখানকার 'সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট' পার্টিকে ক্ষমতাচ্যুত করেছে। ফিনল্যান্ডে অভিবাসন বিরোধী অতি দক্ষিণপন্থী 'ট্রু ফিনস' দল ২৯ শতাংশ ভোট পেয়েছে। সুইডেন এবং ফিনল্যান্ড ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হবার পরে ন্যাটোর সদস্য হয়েছে। স্পেন-এ অতি দক্ষিণপন্থী 'ভক্স' পার্টি তৃতীয় বৃহত্তম দল হিসেবে উঠে এসেছে।

২০২৪ সালে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের নির্বাচনে অতি দক্ষিণপন্থীরা গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি ঘটিয়েছে। ফ্রান্সের মেরি লি পেনের অতি দক্ষিণপন্থী দল ন্যাশনাল র‍্যালি (RN) এই নির্বাচনে ৩১ শতাংশ ভোট পেয়েছে। জর্জিয়া মেলোনির ব্রাদার্স অব ইতালি ২৮.৭৬ শতাংশ ভোট পেয়েছে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের নির্বাচনে অতি দক্ষিণপন্থীদের জোট 'আইডেনটিটি এন্ড ডেমোক্র্যাসি' (ID) গত নির্বাচনের ৫৯টির জায়গায় এবারে ১৩৪টি আসন পেয়েছে। এর মধ্যে জার্মানির অতি দক্ষিণপন্থী দল অলটারনেটিভ ফর ডয়েসল্যান্ডের (AfD) (১৬ শতাংশ ভোট) ১৫টি আসন, হাঙ্গেরির ভিক্টর আরবানের অতি দক্ষিণপন্থী দল ফিডেস-এর ১১টি আসন ধরা হয়নি।

ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের নির্বাচনে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোর দল 'রিভ্যালি ইউরোপ' ১৩.৮ শতাংশ ভোট পেয়ে তৃতীয় স্থানে নেমে আসায় ফ্রান্সে রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি হয়, ফলে প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রো ফরাসি পার্লামেন্টকে ভেঙে দিয়ে ২০২৪-এর জুনের শেষে দ্রুত নির্বাচনের ঘোষণা করেন। ৩০ জুনের প্রথম দফার ভোটে মেরি লি পেনের ন্যাশনাল র‍্যালি সর্বোচ্চ ভোট পায় (৩৩ শতাংশ), কিন্তু ৫০ শতাংশের নীচে ন্যাশনাল র‍্যালির ভোট থাকায় দ্বিতীয় দফায় ভোট হয়। অতি দক্ষিণপন্থীদের ক্ষমতায় চলে আসার সম্ভাবনাকে মাথায় রেখে সমস্ত বামপন্থীরা একত্রিত হয়ে 'নিউ পপুলার ফ্রন্ট' (NFP) গঠন করে যার মূল নেতৃত্বে ছিলেন বামপন্থী জ্য-লুক মেলোশো। কমিউনিস্ট পার্টি অব ফ্রান্সও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। প্রথম দফার ভোটে ২৮ শতাংশ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে তারা। নিজেদের মধ্যের বিভিন্ন মতপার্থক্য দূরে সরিয়ে রেখে সমস্ত বামপন্থী দলগুলি নব্য-উদার অর্থনীতিকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করে এবং অতি দক্ষিণপন্থার পরিবর্তে বামপন্থী অ্যাজেন্ডাকে সামনে রেখে তারা নির্বাচনে লড়েন। পেনশন সংস্কার আইন বাতিল করা, ন্যূনতম মজুরি অন্ততপক্ষে ১৪ শতাংশ বৃদ্ধি করা, খাদ্যদ্রব্য ও জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি রোধ করার দাবি তারা তুলেছিল। এইসব দাবি পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সংস্থানের জন্য ধনীদের উপর সম্পদ কর বসানো, ধনীদের ওপরে আয়করের হার বৃদ্ধির দাবি করেছিল NFP। ফলে নব্য উদার অর্থনীতির সরাসরি বিরোধিতা করে তারা ভোটে লড়ে। এবং ফ্রান্সের নাগরিকরা নব্য-উদার অর্থনীতির বিরুদ্ধে অতি দক্ষিণপন্থার বদলে বামপন্থীদেরকেই বেছে নেন। ভোটে NFP ১৮৬টি আসন জিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে পরিণত হয়, মেরি লি পেনের ন্যাশনাল র‍্যালি তৃতীয় স্থানে নেমে গেছে। যেহেতু কোনো দলই চূড়ান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেনি, তাই প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রো মাইকেল বার্নিয়ের নামক এক দক্ষিণপন্থীকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত করেন যাঁর স্থায়িত্ব নির্ভর করবে দক্ষিণপন্থীদের হাতেই। এই সময়কালে ইউরোপে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সব থেকে বড় প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে ফ্রান্সের বামপন্থীরা।

ব্রিটেনে লেবার পার্টি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে ২০২৪-এর জুলাই মাসের ভোটে। কিন্তু তাদের ইস্তেহার থেকে এটা পরিষ্কার যে তারা নব্য-উদার অর্থনীতিই অনুসরণ করবে। নব্য-উদার অর্থনীতির পথে হাঁটতে গিয়ে লেবার পার্টি তাদের অত্যন্ত জনপ্রিয় সমাজতান্ত্রিক নেতা জেরেমি করবিনকে পর্যন্ত দল থেকে বের করে দিয়েছে। করবিন নির্দল হিসেবে দাঁড়িয়ে ভোটে জিতে পার্লামেন্টে গিয়েছেন। এই ভোটে প্রথমবারের জন্য অতি দক্ষিণপন্থী দলগুলি পার্লামেন্টে প্রবেশ করেছে প্রায় ১৪ শতাংশ ভোট পেয়ে। কনজারভেটিভ পার্টির ভোটের একটা বড় অংশ দখল করেছে নাইজেল ফারাজের অতি দক্ষিণপন্থী রিফর্ম পার্টি। ফলে আগামী দিনে ব্রিটেনের রাজনীতি কোন দিকে যাবে তার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

এবছরের ২৫ ফেব্রুয়ারি জার্মানির পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ বুন্ডেনস্ট্যাগ-এ ভোটের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। অতি দক্ষিণপন্থীরা বিপুল ভোট পেয়ে ক্ষমতায় উঠে এসেছে। ক্ষমতাসীন 'সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি'র ভোট ২৫.৭ শতাংশ থেকে নেমে এসেছে ১৬.৪ শতাংশে। সর্বোচ্চ ভোট পেয়েছে মধ্য দক্ষিণপন্থী দল ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটিক ইউনিয়ন অফ জার্মানি (CDU)। ভোট পেয়েছে ২৮.৫২ শতাংশ। দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে অতি দক্ষিণপন্থী দল অল্টারনেটিভ ফর ডয়েসল্যান্ড (AfD), ২০.৮ শতাংশ ভোট পেয়ে। দক্ষিণপন্থী এবং অতি দক্ষিণপন্থীরা সম্মিলিতভাবে ৫০ শতাংশ ভোট পেয়েছে এবং ৬৩০টি আসনের মধ্যে ৩৬০টি আসন অধিকার করেছে। এটা এই সময়ে অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক যে বামপন্থীদের ভোটের হার গত বছরের ৪.৯ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৮.৭৭ শতাংশ হয়েছে এবং মোট ৬৪টি আসন তারা দখল করেছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে দেখলে জার্মানি দক্ষিণপন্থার কবলে যাচ্ছে বলা যায়।

ইতিমধ্যে ইউরোপের বৃহৎ শক্তিগুলি সামরিক খাতে খরচ বাড়াতে শুরু করেছে। জার্মানির নতুন চ্যান্সেলর ফ্রেডরিস মেয়াসে প্রতিরক্ষা খাতে খরচ বাড়িয়ে জিডিপির ৩ শতাংশ করতে চলেছেন। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টও প্রতিরক্ষা খাতে খরচ ২.১ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৫ শতাংশ করবেন বলে ঘোষণা করেছেন, বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন এই খাতে খরচ বাড়িয়ে ২.৫ শতাংশ করবেন।

ইউরোপের অতি দক্ষিণপন্থীরা সাধারণত কৃচ্ছ্রসাধনের মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণীর উপর শোষণ নামিয়ে আনা, অভিবাসনের বিরোধিতা করা, ইসলাম আতঙ্ক ছড়ানো, ইজরায়েলের পক্ষে দাঁড়ানো, গাজার বিরোধিতা করা এই সব বক্তব্য হাজির করে নব্য-উদার অর্থনীতি সঞ্জাত দারিদ্র্য, বেকারী, মূল্যবৃদ্ধির মতো গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলিকে চাপা দিতে চায়। কিন্তু ইউরোপের সাধারণ মানুষ বিভিন্ন সময়ে এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে চলেছেন।

দু'বছর আগে ২০২৩ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি গ্রীসে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনার দু'বছর পূর্তি উপলক্ষে "Their profits or our lives"—এই স্লোগান দিয়ে এ বছরের ২৮ ফেব্রুয়ারি একটি ব্যাপক ধর্মঘট সংঘটিত হয়। এথেন্স সহ সম্পূর্ণ গ্রীস স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল এই ধর্মঘটে। মূলত পরিবহন পরিকাঠামোকে ত্রুটিমুক্ত করার ক্ষেত্রে তীব্র অবহেলার বিরুদ্ধে এই ধর্মঘট হলেও সামগ্রিকভাবে নব্য-উদার অর্থনীতির বিরুদ্ধেই মানুষ তার ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন এই ধর্মঘটের মাধ্যমে। "murderers"; "I have no oxygen"; এবং "Privatization kill" ইত্যাদি স্লোগান লেখা প্ল্যাকার্ড ও ফেস্টুন নিয়ে মানুষ নেমে এসেছে রাস্তায়। রক্ষণশীল 'নিউ ডেমোক্রাসী' দলের সরকার যে কোনো মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে এই ধর্মঘটের চাপে। গ্রীসের কমিউনিস্ট পার্টি এই ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে স্লোগান তুলেছে "The profit of the capitalists suffocate the needs of the people. Our breath of life is the struggle for our just cause to overthrow this system!"

এ প্রসঙ্গে বলা দরকার যে কমিউনিস্ট পার্টি অব গ্রীস (KKE) ক্রমাগত তাদের শক্তিবৃদ্ধি করে চলেছে। ২০১৯ সালের ইউরোপীয়ান পার্লামেন্টের নির্বাচনে পর ৫.৩৫ শতাংশ ভোট পেয়েছিল। ২০২৩ সালের সে দেশের নির্বাচনে ভোটের হার বেড়ে হয় ৭.৭ শতাংশ এবং ২০২৪-এর ইউরোপীয়ান পার্লামেন্টে তা দাঁড়িয়েছে ৯.২৫ শতাংশ। জনগণের সঙ্গে দৈনন্দিন যোগাযোগের ভিত্তিতে তাদের সমস্যা নিয়ে প্রকৃত আন্দোলন গড়ে তোলার মধ্য দিয়েই এই অগ্রগতি সম্ভব হচ্ছে। ঠিক একইভাবে ওয়ার্কার্স পার্টি অব বেলজিয়াম (PVDA-PTB) ইউরোপের নির্বাচনে ১০ শতাংশ ভোট পেয়েছে এবং ১২ জন সদস্য থেকে ১৫ জন বিজয়ী সদস্যকে ইউরোপের পার্লামেন্টে পাঠিয়েছে।

একইভাবে গত ১০ মার্চ জার্মানিতে শত শত ফ্লাইট বাতিল হয়েছে বিমানবন্দরের কর্মীরা সারা দেশজুড়ে মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে ধর্মঘট করায়। জার্মানির সব থেকে বড় বিমানবন্দর ফ্রাঙ্কফোর্ট সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল এই ধর্মঘটে। লুফথানসা গ্রুপের অসংখ্য উড়ান বাতিল হয়ে যায়। এছাড়াও স্টুটগার্ড, ডাসেল ডর্ফ, কোলোন এবং বার্লিন বিমানবন্দরও প্রায় স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। ধর্মঘটীদের মূল দাবি ছিল মাসে অন্তত ৩৫০ ইউরো করে মজুরি বৃদ্ধি, তিনদিন অতিরিক্ত ছুটি এবং ইউনিয়ন সদস্যদের সাংগঠনিক কাজের জন্য আরও একদিনের অতিরিক্ত ছুটি।

ফলে একদিকে ইউরোপে যেমন অতি দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার দাপাদাপি রয়েছে তেমনি তার বিরুদ্ধে বামপন্থীদের নেতৃত্বে শ্রমজীবীদের প্রতিরোধও বহাল আছে। একমাত্র শ্রমজীবীদের লড়াই, ঐক্য ও প্রতিরোধ বিশ্বকে অতি দক্ষিণপন্থার হাত থেকে রক্ষা করে—ইতিহাস বার বার একথা প্রমাণ করেছে। □

প্রথম পৃষ্ঠার পরে

আন্তর্জাতিক নারী দিবস প্রতিপালিত

সালে জন্মেছিলেন। রামমোহন, বিদ্যাসাগররা তাঁর সমসাময়িক। কিন্তু রামমোহন, বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে যত কথা শোনা যায়, সাবিত্রী বাঈ ফুলে সম্বন্ধে ততটা শোনা যায় না। এর কারণ হল, আমাদের একটা ধারণা আছে যে সাধারণত মহান কাজকর্মগুলো পুরুষরাই করে। ধারণাটা ভুল। সাবিত্রী বাঈ ফুলে একজন কবি ছিলেন। তিনি প্রথম শিক্ষিকা হিসেবে ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে মর্যাদা পেয়েছিলেন, পুরস্কার পেয়েছিলেন। মাত্র ন'বছর বয়সে ১৩ বছর বয়সী জ্যোতিরাও ফুলের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। তখন সাবিত্রী বাঈ নিরক্ষর ছিলেন, আর জ্যোতিরাও ফুলে ছিলেন ক্লাস সেভেন পাশ। জ্যোতিরাও ফুলে মালি পরিবারে জন্মেছিলেন, যারা ছিল শূদ্র বর্ণভুক্ত। তাদের কোনো পড়াশোনার অধিকার ছিল না। ব্রিটিশরা আসার পর কিছু মিশনারি স্কুলের প্রতিষ্ঠা হয়, যেখানে কিছু শূদ্র এবং অস্পৃশ্যরা পড়াশোনার সুযোগ পায়। আমরা একটা পিতৃতান্ত্রিক সমাজে বাস করছি যেখানে মহিলাদের অধিকার কম। আমরা বলছি বটে যে আমরা মনুস্মৃতি আনতে দেব না, কিন্তু মনুস্মৃতি চলছে। বিয়ে করার পর জ্যোতিরাও যখন মাঠে কাজ করতে যেতেন, বউকে খাবার নিয়ে যেতে হতো। সেই সময় জ্যোতিরাও যতটা নিজে জানেন ততটুকু বউকে পড়াতেন। কিন্তু বিষয়টা প্রকাশ হয়ে গেল। বাড়ির বউয়ের এই পড়াশোনা জ্যোতিরাওদের বাড়িতে মেনে নিল না। জ্যোতিরাওকে বাড়ি থেকে বার করে দেওয়া হলো। তখন জ্যোতিরাওয়ের ২১ বছর বয়স এবং সাবিত্রীর ১৭ বছর। জ্যোতিরাও বউকে নিয়ে বন্ধু উসমান সেখ-এর বাড়িতে আশ্রয় নেন। সেখানে উসমানের বোন ফতিমার সঙ্গে সাবিত্রীর বন্ধুত্ব হয়। ফতিমা লিখতে পড়তে জানতেন। সাবিত্রী ও ফতিমার মধ্যে এক গভীর সখ্যতা ও সহযোগিতার বন্ধনের সূচনা হয়। তাঁরা দুজনে একটি মিশনারি স্কুলে শিক্ষিকা হওয়ার প্রশিক্ষণ নেন। এর পর সাবিত্রী ভারতের প্রথম প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষিকা হন। জ্যোতিরাও ও সাবিত্রী ১৮৪৮ সালে পুণেতে মেয়েদের জন্য একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এই স্কুল স্থাপন করে তাঁরা খোলাখুলিভাবেই ব্রাহ্মণ আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করেন। প্রথমে এই স্কুলে ন'জন ছাত্রী ভর্তি হয়, যারা সকলেই শূদ্র-অতিশূদ্র পরিবারের সন্তান। পরে সেই সংখ্যাটা বেড়ে ২৫ হয় এবং তার পর ৭০-এ দাঁড়ায়। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা হন সাবিত্রী বাঈ ফুলে। ফতিমা এবং শগুনাবাঈ নামে জ্যোতিরাওয়ের এক আত্মীয়াও সেই স্কুলে পড়াতেন। সাবিত্রীর স্কুল চালানোটাকে আশেপাশের মানুষজন ভালো চোখে দেখত না। গ্রামের উঁচু জাতির মানুষের মনে রাগ ও বিরক্তির সঞ্চার হতে লাগলো। ফলে নানা দিক থেকে বাধা আসতে থাকে। ছেলেরা তাঁকে গালাগালি করত এবং গোবর, পচা ডিম, ইঁট-পাটকেল ইত্যাদি ছুঁড়ত। সব সহ্য করে তিনি স্কুল চালাতেন। ধীরে ধীরে সাবিত্রী বাঈ ও জ্যোতিরাও আরো অনেকগুলো স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। সাবিত্রী বাঈ নিজেও একজন সংগঠক হয়ে উঠেছিলেন। জ্যোতিভা মারা যাওয়ার পর সাবিত্রী বাঈ একা সবকিছুর দায়িত্ব সামলান। ১৮৯৭ সালে বিশ্বব্যাপী প্লেগ মহামারী দেখা দেয়। সাবিত্রী বাঈ নিজে প্লেগে আক্রান্ত রোগীদের সেবা করতেন। এক সময় একটি প্লেগে আক্রান্ত বালকের সেবা করতে গিয়ে তিনি নিজে প্লেগে আক্রান্ত হলেন এবং ৬৬ বছর বয়সে প্রয়াত হলেন। দেশ এক মহান সামাজিক কর্মী ও সমাজ সংস্কারককে হারালো। সাবিত্রী বাঈ ফুলের উত্তরাধিকার হওয়ার জন্য আমাদের যোগ্য হয়ে উঠতে হবে।

আজ রাজ্যে এবং দেশের বহু জায়গায় মহিলাদের ব্যবহার করা হচ্ছে। লক্ষীর ভাণ্ডার দিয়ে তাঁদের ভোটে টেনে আনা হচ্ছে। এটা খুব স্পর্শকাতর বিষয়। এটা নিয়ে ব্যঙ্গ করা উচিত নয়। কিন্তু এমন অনেক মহিলাকে দেওয়া হচ্ছে যাঁদের প্রয়োজন নেই। আবার প্রয়োজন আছে এমন অনেককে বঞ্চিত করা হচ্ছে।

অধ্যাপক দেবেশ দাসের বক্তব্য শেষ হওয়ার পর সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষ থেকে গীতা দে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। □

ইন্দ্রজিৎ রায় চৌধুরী

Editor : MANAS KUMAR BARUA
SANGRAMI HATIAR
State Co-ordination Committee
52nd Year, 9th & 10th Edition, January-Febryary, 2025
Regd. No. : 18484/71

পুঁজিবাদ বাঁচাও অভিযান

সি পি চন্দ্রশেখর

ডোনাল্ড ট্রাম্প ও তাঁর খিদ্‌মদগাররা মার্কিন রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে মোটেই ভেঙে ফেলতে চাইছে না। বরং তাদের লক্ষ্য হল রাষ্ট্রব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে এনে, অতি ধনীদের স্বার্থ আরও ভালোভাবে রক্ষা করার যন্ত্রে পরিণত করা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় দফার প্রথম মাস যদি কোনো ইঙ্গিত দিয়ে থাকে তা হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্যের অধীন বিশ্বপুঁজিবাদ অন্তর্নিহীত তাড়নায় সম্ভবত এক পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার দিকে এগোচ্ছে। এটা লক্ষ্য করা দরকার যে বর্তমান পুনর্গঠন প্রক্রিয়া, অতীতের পুনর্গঠনের অধ্যায়গুলির মতোই যেমন, মহামন্দার পরবর্তীতে গৃহীত 'নতুন ব্যবস্থা' (নিউ ডিল) এবং সত্তর দশকের মুদ্রাস্ফীতিজনিত সঙ্কটের পরবর্তীতে গৃহীত নয়া উদারবাদী ব্যবস্থা—সম্পূর্ণ নীতিগত বিষয়। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই নীতিগত পরিবর্তনের বাধ্যবাধকতা ও প্রয়োজন তৈরি হয়েছিল সঙ্কটাপন্ন বিশ্ব ব্যবস্থার কারণে এবং নীতিগত পরিবর্তন উত্তর সঞ্চয় প্রক্রিয়ায় যার প্রভাব পড়েছিল।

ঘরে ও বাইরে মার্কিন নীতি পরিবর্তনের যে প্রাথমিক ইঙ্গিতগুলি ট্রাম্প প্রশাসনের কাছ থেকে পাওয়া গেছে, তার মধ্যে পাঁচটি পদক্ষেপ অর্থনীতি সংক্রান্ত। এর মধ্যে প্রথমটি হল, মার্কিন উৎপাদন ব্যবস্থাকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা এবং উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের হার বৃদ্ধি করা থেকে শুল্ককে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে জাতীয় নিরাপত্তার লক্ষ্যে পৌঁছোনো। যদিও এই বিষয়ে ঘোষিত নীতি ও তার প্রয়োগ সবটাই সুচিন্তিত নয় এবং প্রতিবন্ধকতাও রয়েছে। কিন্তু এটা স্পষ্ট যে মার্কিন উৎপাদকদের দেশে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা, সবটাই ভনিতা নয়।

যদিও কানাডা ও মেক্সিকোর ওপর ২৫ শতাংশ শুল্ক চাপানোর সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার আভাস পাওয়া যাচ্ছিল, কিন্তু কিছুটা বিলম্বে হলেও তা কার্যকর করা হয়েছে। চীন থেকে আমদানিকৃত পণ্যের ওপর চাপানো অতিরিক্ত ১০ শতাংশ শুল্কের হারও বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিশ্ব এখন অপেক্ষা করছে অটোমোবাইল, ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম সহ আরও অনেক পণ্যের ওপর কী হারে শুল্ক চাপানো হয় তা দেখার জন্য এবং সমস্ত বাণিজ্য সঙ্গীদের শায়েস্তা করার লক্ষ্যে তাদের কাছ থেকে আমদানিকৃত পণ্যের ওপর কিভাবে পাল্টা শুল্ক চাপানো হবে তা দেখার জন্য।

দ্বিতীয় প্রসঙ্গটি হল রাষ্ট্রের ওপর বৃহৎ বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করার নির্লজ্জ প্রদর্শনী। এযাবৎকাল স্বাধীন সরকারী তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে, সিকিউরিটি এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এস ই সি) ও ফেডারেল ট্রেড কমিশন (এফ টি সি) সহ এক অধ্যাদেশ জারি করে হোয়াইট হাউসের অধস্তন সংস্থায় পরিণত করা হয়েছে। এখন থেকে এই সংস্থাগুলির কাজের ওপর নজর রাখা হবে এবং তাদের সিদ্ধান্ত হবে হোয়াইট হাউসের অনুমোদন সাপেক্ষ। এর আশু প্রভাব পড়বে ক্রিপ্টো-কারেন্সী ব্যবস্থায় এস ই সি'র নিয়ন্ত্রণ স্থাপনের উদ্যোগে এবং আমাজন ও মেটার মতো প্ল্যাটফর্ম সংস্থার একজেটিয়া ব্যবসা নিয়ন্ত্রণে এফ টি সি তার পূর্বতন কমিশনার লীনা খাঁর নেতৃত্বে যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল তার ওপরে।

ট্রাম্প পরিচালিত রাষ্ট্র ও মার্কিন বৃহৎ পুঁজির অশুভ আঁতাত প্রকাশ্যে চলে এসেছে। ট্রাম্প শপথ গ্রহণ করার দিন থেকেই সামনের সারির ব্যবসায়ীরা শুধুমাত্র যে ট্রাম্পের পেছনে ভীড় করেছে তাই নয়, এদের মধ্যে কয়েকজনকে ট্রাম্পের নীতি নির্ধারক সংস্থায় যুক্তও করা হয়েছে। যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, 'এক্স' ও 'তেসলা' খ্যাত এলন মাস্ক। যাকে নির্দিষ্টভাবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মার্কিন সরকারের যে বিষয়গুলি বৃহৎ পুঁজির পছন্দ নয়, এমন সমস্ত বিষয়ের ওপর দ্রুত আঘাত নামিয়ে আনার জন্য। এবং বৃহৎ ব্যবসায়ীদের কর ছাড় ও অন্যান্য সাহায্য করার জন্য 'দক্ষতা বৃদ্ধি'-র অছিলায় সরকারী সম্পদের হস্তান্তর ঘটানো হচ্ছে।

বাস্তব হল, ট্রাম্প প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেছেন যে, মাস্কের অধীনের থাকা ডিপার্টমেন্ট অফ গভর্নমেন্ট এফিসিয়েন্সি (ডি ও জি ই) ৫০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি সাশ্রয় করবে, যার ২০ শতাংশ মার্কিন জনগণের স্বার্থে ব্যয় করা হবে, আরও ২০ শতাংশ ব্যয় করা হবে সরকারী ঋণভার হ্রাস করার জন্য। এরপরেও যথেচ্ছ ব্যবহারের জন্য ৬০ শতাংশ কিন্তু হাতে থাকছে।

তৃতীয় উদ্যোগটি হল, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে বিদেশী অংশীদারদের কাছে আগ্রাসী চাহিদা রাখা এবং বিশ্ববাণিজ্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ জারি রাখার জন্য অবস্থানগত দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলি যেমন গ্রীনল্যান্ড, পানামা ক্যানাল অথবা প্যালেস্তিনীয়দের বিতারিত করে পড়ে থাকা গাজা ভূখণ্ডে অবাধ প্রবেশের অধিকার এমনকি মালিকানা হাতিয়ে নেওয়া। এই আগ্রাসী চাহিদার উল্টোদিকে রয়েছে সহযোগীদের সুরক্ষার জন্য মার্কিন সরকার যে ব্যয় করত তা প্রত্যাহার করে নেওয়া এবং এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সহযোগিতামূলক রাজনীতির অবসান ঘাটনো।

চতুর্থ প্রসঙ্গটি যা ট্রাম্পের আন্তর্জাতিক কৌশলী পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট তা হল, আজ ভয় দেখিয়ে এবং ভবিষ্যতে সম্ভবত জোর খাটিয়ে ইউক্রেন, গ্রীনল্যান্ড বা যেখানেই হোক দুর্মূল্য খানিজ ভাণ্ডার ও তার যোগানের ওপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন।

সর্বোপরি একদিকে রাশিয়া অপরদিকে ইউরোপের প্রতি ট্রাম্পের পরিবর্তনশীল অবস্থানও লক্ষ্যণীয়। বাজার ও খনিজ পদার্থের সুবিধা পাওয়ার জন্য রাশিয়ার সাথে বোঝাপড়ায় আসা, অপরদিকে ইউরোপ, যারা মার্কিন বাজার থেকে লাভ করা সত্ত্বেও নিজেদের সুরক্ষার বিনিময়ে কোনো মূল্য দেয় না তাদের পরিত্যাগ করা। এই পদক্ষেপগুলির মধ্য দিয়ে বাস্তব ও প্রতীকি উভয় উদ্দেশ্যই সাধিত হবে। প্রতীকি উদ্দেশ্য এমন হতে পারে যে, ট্রাম্প বিদেশী পণ্যের ওপর শুল্ক চাপিয়ে মার্কিন উৎপাদকদের দেশে ফিরিয়ে আনাতে চাইছেন কারণ তার লক্ষ্য হল সাদা চামড়ার শ্রমিক শ্রেণীকে খুশি করা। এই অংশটিই ট্রাম্পকে ক্ষমতায় ফিরে আসতে সাহায্য করেছে। অথচ একসময় এই সম্ভাবনাকে শয়তানের শূন্য আস্ফালন বলে মনে হত। এই ভোটাররাই মার্কিন পুঁজি, বিশেষত মার্কিন লগ্নীপুঁজি দ্বারা পরিচালিত বিশ্বায়নের ধাক্কায় পিছনে পড়েছিল। সর্বাধিক ধনী এক শতাংশ এই প্রক্রিয়ায় যে বিপুল মুনাফা করেছে, তা এই সাদা ভোটারদের ক্ষুব্ধ করে এক উন্মাদের প্রশ্নহীন অনুগত বাহিনীতে পরিণত করেছে। অতি ধনীর পৌষ মাস আর তাদের সর্বনাশের জন্য তারা অভিজাত গোষ্ঠী আর রাষ্ট্রকেই দায়ি করে। ট্রাম্পের রাষ্ট্রবিরোধী অবস্থান, এই অংশের প্রশ্নহীন আনুগত্যকে আরও জোরদার করার জন্যই।

বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে ইতিহাসকে পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায়, ট্রাম্পের দ্বিতীয় দফার নীতিসমূহের নাটকীয় পরিবর্তন আসলে একবিংশ শতাব্দীর পুঁজিবাদের পুনর্গঠনের মাধ্যমে মার্কিন পুঁজিকে বিশেষ সুবিধা প্রদান করা। কারণ বর্তমান পুঁজিবাদী চলন প্রক্রিয়া তার ন্যায্যতা হারিয়েছে এবং এইভাবে আর এগোতে পারছে না।

এই নতুন পথের সন্ধান হল পুঁজিবাদের কাঠামোগত পরিবর্তন। ঠিক যেমনটা হয়েছিল ১৯৭০ দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমী দুনিয়ার অন্যত্র মুদ্রাস্ফীতিজনিত সঙ্কটের পরে। সেই সময়কার পরিবর্তনের মূল বিষয় ছিল সক্রিয় আর্থিক নীতি ও লগ্নীপুঁজির ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে পরিচালিত কেইনসীয় প্রথার নিও-ডিলকে বাতিল করে অর্থনৈতিক বিনিয়ন্ত্রণ, কঠোর মুদ্রা ও আর্থিক নীতি সমূহের ভিত্তিতে ঋণনির্ভর বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে সুনিশ্চিত করা।

যার অর্থ হল রাষ্ট্রকে ব্যবহার করে নিম্ন ও মধ্য আয়ের অংশ থেকে ধনী ও অতিধনীদের দিকে আয় ও সম্পদের পুনর্বণ্টন। এই প্রক্রিয়াই নয়া উদারবাদের শ্রেণী প্রকল্পের সংজ্ঞা। এর যাত্রা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হয়ে দ্রুত অন্যান্য উত্তর আতলান্তিক রাষ্ট্রগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে।

উল্লিখিত কাঠামোগত পরিবর্তনের পরবর্তী পর্বে সাম্প্রতিক সময়ে পুঁজিবাদী যে সঙ্কটের মুখোমুখি হয়েছে তার দুটি দিক রয়েছে।

অর্থনৈতিক বুদবুদের পিঠে চেপে পুঁজির সঞ্চয় প্রক্রিয়া যা সারা পৃথিবীর মুষ্টিমেয় কয়েকজনের সম্পদের অস্বাভাবিক স্ফীতি ঘটিয়েছে, তাকে বজায় রাখা কঠিন বলে প্রমাণিত হয়েছে। ২০০৮-এর অর্থনৈতিক সঙ্কটের পরে একচেটিয়া প্রভু ও তার সাগরেদরা কিছু উদ্ভট নীতির মাধ্যমে এই প্রক্রিয়া শুরু করেছিল—যেখানে প্রকাশ্যে ঘোষণা হয়েছিল, যে নীতি তারা সারা পৃথিবীর ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে, তা তাদের নিজেদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কিন্তু এত কিছু করেও পুঁজিবাদে নিজেকে নিজের থেকেই রক্ষা করতে পারছে না।

অধিকন্তু, বিগত শতাব্দীতে পুঁজিবাদের দু'দশক ব্যাপী স্বর্ণযুগ যা ষাটের দশকের শেষ দিক পর্যন্ত বজায় ছিল এবং যার বৈশিষ্ট্য ছিল বৃদ্ধির উচ্চহার, নিয়ন্ত্রিত মুদ্রাস্ফীতি, প্রায় সম্পূর্ণ কর্মসংস্থান ও একটি জনকল্যাণকামী রাষ্ট্র (এক ধরনের), তা সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়েছে। তাই রাজনৈতিক দিক বিচার করলেও বলা যায়, "কোনো পরিবর্তন না করে শাসকশ্রেণীর পক্ষে শ্রেণী শাসন বজায় রাখা সম্ভব নয়।" এই ধরনের পরিস্থিতিকেই লেনিন বিপ্লবী পরিস্থিতি বলেছিলেন। ট্রাম্পের নেতৃত্বে মার্কিন পুঁজি যেভাবে এগোতে চাইছে এবং তার "আমেরিকাকে আবার মহান কর" নামক এজেন্ডাটি আসলে মার্কিন অপকর্মের দোসর রাষ্ট্রগুলি সহ সকলের স্বার্থের বিনিময়ে মার্কিন পুঁজিবাদকে রক্ষা করা।

ট্রাম্প ও তার অনুচররা মার্কিন রাষ্ট্রকে মোটেই ধ্বংস করতে চায় না। বরং তাদের লক্ষ্য হল এই রাষ্ট্রের ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করে, একে অতি ধনীদের স্বার্থে আরও বেশি করে ব্যবহার করা ও এদের পক্ষেই আয় বণ্টনের সিংহভাগ সুনিশ্চিত করা। পাশাপাশি বোধবুদ্ধিহীন অনুগত সমর্থকদের কিছু আর্থিক সুবিধা পাইয়ে দেওয়া।

সম্ভবত তাদের ধারণা হল, সারা পৃথিবীর সম্পদের দখল নিয়ে এবং সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় সঙ্কোচ করে, মার্কিন বৃহৎ পুঁজির হাতে প্রচুর অর্থ তুলে দেওয়া যাবে। পাশাপাশি ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা শ্বেত শ্রমিক শ্রেণীকে কিছু ভিক্ষাও দেওয়া যাবে।

আন্তঃসাম্রাজ্যবাদী সম্পর্ক এর মধ্য দিয়ে একটা নতুন চেহারা গ্রহণ করেছে। এটা দুটি বিশ্বযুদ্ধের কারণ যে আন্তঃসাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ্ব, তার সাথে মিলবে না। এমনকি আন্তঃসাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ্ব অনুপস্থিত তাও নয়। বরং এটি একটি একচেটিয়া শক্তির দ্বারা স্বার্থপরের মতো অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দোসরদের অধস্তন স্তরে নামিয়ে এনে, নিজ দেশের পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করা। যদিও এর পরিণীতি হল পূর্বতন শত্রুদের শয্যাসঙ্গী হওয়া।

এর স্বপক্ষে সম্ভাব্য যুক্তি হল বাকি পৃথিবীকে কোনো না কোনো উপায়ে উপনিবেশে পরিণত করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে পুঁজির অস্থায়ী সঞ্চয় প্রক্রিয়াকে দীর্ঘায়িত করা। তত্ত্ব ও ইতিহাস থেকে আমাদের শিক্ষা হল, এটি একটি উদ্ভট ও ব্যর্থ প্রচেষ্টা, পুঁজিবাদের পক্ষে যার পরিণতি ভালো হবে না। কিন্তু মার্কিন বিলিওনেয়াররা তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য বিপুল বিনিয়োগ করলেও, তারা আসলে তাদের লাভের লালসা এবং রক্তপিপাসু কর্মসূচী (যা একদিন ধসে পড়বেই) চরিতার্থ করার কোনো অকল্পনীয় পথ খুঁজে বের করার জন্য এক উন্মাদের ওপর বাজি ধরছে। □

অনুবাদক ঃ সুমিত ভট্টাচার্য
(সৌজন্যে ফ্রন্টলাইন পত্রিকা ৩১ মার্চ, ২০২৫)

শোক সংবাদ

কমরেড তরুণ ভট্টাচার্য

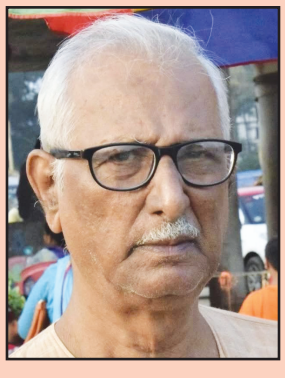

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রাক্তন সহসভাপতি কমরেড তরুণ ভট্টাচার্যের জীবনাবসান ঘটেছে। বিগত ১৬ ফেব্রুয়ারি '২৫ কলকাতার একটি বেসরকারী হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। তিনি রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্তর্ভুক্ত সংগঠন ওয়েস্ট বেঙ্গল ডেয়ারি ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড এনিম্যাল হাজব্যান্ড্রি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদকও ছিলেন।

কমরেড তরুণ ভট্টাচার্য ৩ জানুয়ারি ১৯৪২ সালে সাবেক বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলীতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৬৫ একজন ট্রেনি সুপারভাইজার হিসাবে সেন্ট্রাল ডেয়ারিতে চাকুরিতে যোগদান করেন। চাকুরি জীবনের শুরু থেকেই তিনি সংগঠনের সাথে যুক্ত হন। ১৯৮৬ সালে সমিতির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত তিনি ঐ পদে ছিলেন। ১৯৯৬ থেকে ২০০৪ অবধি কমরেড ভট্টাচার্য সমিতির কার্যকরী সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৯২ সালে বর্ধমানে অনুষ্ঠিত দশম রাজ্য সম্মেলন থেকে তিনি রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হন। ২০০৪ সাল পর্যন্ত তিনি এই দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৯৫ থেকে ১৯৯৯ পর্যন্ত তিনি রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সহসভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন বিষয়ে এবং বামপন্থী মতাদর্শে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল প্রশ্নহীন। ২০০২ সালে চাকুরি থেকে অবসরগ্রহণের পর তিনি এলাকার গণআন্দোলনের সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। সুবক্তা, সুলেখক কমরেড ভট্টাচার্যের মৃত্যুর খবরে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে কর্মচারী মহলে। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন।

কমরেড ভট্টাচার্যের অঙ্গীকার অনুযায়ী আর জি কর হাসপাতালে তাঁর মরদেহ চিকিৎসা বিজ্ঞানের স্বার্থে দান করা হয়। কমরেড তরুণ ভট্টাচার্যের পুত্র, কন্যা ও তাঁদের পরিবার বর্তমান। বিগত ৮ মার্চ '২৫ তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে আয়োজিত স্মরণসভায় অন্যান্য নেতৃত্বের সাথে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য আশীষ ভট্টাচার্য তাঁর স্মৃতিচারণা করে শ্রদ্ধা জানান। □

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি, পূর্ব বর্ধমান জেলা শাখার উদ্যোগে গত ১১ মার্চ, ২০২৫, বর্ধমান কর্মচারী ভবনে "আন্তর্জাতিক নারী দিবস" উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচ্য বিষয় "বর্তমান ভারত ও সমাজ সংস্কারক সাবিত্রী বাঈ ফুলের উত্তরাধিকার"। আলোচনা করেন ছায়া মণ্ডল, নীলা দাস, ইন্দিরা চ্যাটার্জী, সুস্মিতা বুট, শ্যামশ্রী ব্যানার্জি এবং জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদক বিদ্যুত দাস। আলোচকরা সমাজ সংস্কারক সাবিত্রী বাঈ ফুলের অবদান তুলে ধরে বর্তমানে রাজ্য ও দেশে অপশাসনের বিরুদ্ধে তাঁর যোগ্য উত্তরাধিকার হয়ে ওঠার অঙ্গীকার করেন। শতাধিক মহিলা ও পুরুষ আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন। রীণা কোণার ও বাসন্তী দাসকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী সভার কাজ পরিচালনা করেন। □

সম্পাদক ঃ মানস কুমার বড়ুয়া
সহযোগী সম্পাদক ঃ সুমন কান্তি নাগ
যোগাযোগ ঃ
ই-মেল ঃ sangramihatiar@gmail.com
ওয়েবসাইট ঃ www.statecoord.org
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১০-এ শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪, হইতে প্রকাশিত।